সাগরপারের
রূপকথা
সলিল
লাহিড়ী

সাগর পারের রূপকথা

সলিল লাহিড়ী

পারমিতা পাবলিকেশন
৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

বাবা—মা

শ্রীচরণেষু—

লেখকের কথা—

কল্পনার রাজ্য আর বাস্তবের জগতের মাঝখানে সেতুবন্ধনের কাজ করে রূপকথা। তাই রূপকথা বিভিন্ন দেশে বিভিন্নতর রূপ নিয়েছে।
সাগরপারের রূপকথায় ল্যাটভিয়ান কিছু কিছু রূপকথার ছায়া আছে। কিশোর পাঠকদের কাছে সহজবোধ্য করবার জন্য নাম স্থান এগুলোকে সহজ রূপধারার মধ্যে রাখা হয়েছে।
শিশু ও কিশোরদের কাছে এই রূপকথাগুলো আদৃত হবে এই আমার বিশ্বাস।

—সলিল লাহিড়ী

সূচীপত্র—

চিত্রসূচী—

সাগর পারের রূপকথা

ভিন্‌দেশী হেসে বল্ল—"এইটা তুই নম্বর যাত্ব..."

তিন যাদুর গল্প

এক কৃষকের তিন ছেলে ছিল। বড় আর মেজ ছেলে ছিল ধূর্ত, কিন্তু ছোট ছেলেটা ছিল খুবই ভালমানুষ। কৃষকের বাড়ির কাছেই ছিল একটা নদী। ছেলেরা নৌকা নিয়ে পালা করে সেই নদীতে লোকজন পারাপার করত।

একদিন রাত্রে এক ভিন্‌দেশী লোক বড় ছেলের কাছে এসে বল্ল—"হ্যাগো নদীটা পার করে দেবে?"

"নিশ্চয়ই দেব"—এই বলে বড় ছেলে ভিন্‌দেশীকে নদী পার করে দিল।

নদীর অন্য পারে পৌঁছে ভিনদেশী বড় ছেলেকে বল্ল—'তুমি খুব ভাল ছেলে, বল আমার কাছে কি পুরস্কার চাও? এক থলে ভর্ত্তি সোনা নেবে না তিনটে মজার জিনিস নেবে?'

বড় ছেলে কিছুটা ভেবে বল্ল—"এক থলে ভর্ত্তি সোনাই চাই। অন্য কিছু চাই না।"

"ভাল কথা"—এই বলে ভিন্‌দেশী বড় ছেলেকে এক থলে ভর্ত্তি সোনা দিয়ে হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

দ্বিতীয় রাত্রিতে সেই এক ঘটনাই ঘটল। সেদিন মেজ ছেলে ভিন্‌দেশীকে নদী পার করে দিল। আর আগের মতই ভিন্‌দেশীর কাছ থেকে এক থলে ভর্ত্তি সোনা নিল।

তৃতীয় রাত্রিতে ভালমানুষ বোকা ছেলেটার নদী পারাপার করবার পালা। সেদিনও আবার সেই ভিন্‌দেশী বোকা ছেলেটার কাছে এসে তাকে নদী পার করে দেবার জন্য বল্ল।

"নিশ্চয়ই দেব"—এই বলে ভালমানুষ বোকা ছোট ছেলে ভিন্‌দেশীকে নদী পার করে দিল।

নদীর অন্য পারে পৌঁছে সেই ভিন্‌দেশী ছোট ছেলেকে বল্ল—"ভালমানুষ ছেলে, আমার কাছে কি পুরস্কার নেবে? এক থলে ভর্ত্তি সোনা না তিনটে মজার জিনিস?"

ছোট ছেলে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর বল্ল—"একবস্তা সোনা নিয়ে আমি কি করব? তার চেয়ে তিনটে মজার জিনিস নেওয়াই ভাল।"

তখন ভিন্‌দেশী হেসে বল্লে—"না, তুমি দেখছি তোমার অন্য দুই ভাই এর চেয়ে ঢের চালাক। এই নাও মজার জিনিসগুলো। এটা একটা ঘোড়ার লোম। তুমি তোমার ঠোঁটের মধ্যে এটা রেখে তিনবার মনে মনে যেই বলবে—আমি ঘোড়া হতে চাই, আর অন্য কিছু হতে চাই না, শুধু ঘোড়াই হতে চাই, শুধু একটা ঘোড়া—তখনই দেখবে তুমি হঠাৎ একটা ঘোড়া হয়ে গেছ। আর এইটা দুই-নম্বর যাদু, একটা পায়রার পালক। পালকটা ঠোঁটের মধ্যে ধরে যেই তিনবার মনে মনে বলবে—আমি পায়রা হতে চাই, আর অন্য কিছু হতে চাই না, শুধু পায়রাই হতে চাই—তখনই দেখবে তুমি একটা পায়রা হয়ে গেছ। আর এইটা হচ্ছে শেষ মজার যাদু, একটা মাছের আঁশ। এই আঁশটা ঠোঁটের মধ্যে ধরে যেই বলবে,—আমি মাছ হতে চাই, আর অন্য কিছু হতে চাই না, শুধু মাছই হতে চাই,—তখনই দেখবে তুমি সত্যিই একটা মাছ হয়ে গেছ। এরপর যখন তুমি আবার মানুষ হতে চাইবে, তখন ঘোড়ার লোম, পায়রার পালক, মাছের আঁশ, যখন যেটা দরকার সেটা ঠোঁটের মধ্যে ধরে বলবে,—আমি মানুষ হতে চাই, আর অন্য কিছু হতে চাই না, শুধু মানুষই হতে চাই,—তখনই আবার তুমি মানুষ হয়ে যাবে।"

এই কথা বলে ভিন্‌দেশী হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।
ভালমানুষ ছোট ছেলেটা এই যাদু পরীক্ষা করার জন্য তক্ষুণি পায়রা হয়ে গিয়ে আকাশে উড়ে বেড়াল। তারপর যাদুর সাহায্যে আবার মানুষ হয়ে গেল। ছোট ছেলে তখন বুঝতে পারল ভিন্‌দেশী সত্যি কথাই বলেছে। ছোট ছেলে ভাবল, হাতে তার যখন তিনটে যাদুর জিনিস আছে আর দাদারাও কেউ তাকে পছন্দ করে না, তখন সে তার ভাগ্য পরীক্ষার জন্য অন্যদেশেই যাবে। এই ভেবে ছোট ছেলে তিনটে মজার যাদু নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।
ছেলেটা চলতে চলতে এক গভীর জঙ্গলের সামনে এসে পৌঁছাল। সেই জঙ্গল ছিল খুব গভীর, গাছপালাও ছিল এত বড় যে তার মধ্যে সূর্যের আলোও ঢোকে না। ছেলেটা তার মধ্যে দিয়ে রাস্তা বের করে যাওয়া সম্ভব নয় বুঝতে পারল। কিন্তু ছেলেটা তার জন্য একটুও ভয় পেল না। সে তক্ষুণি যাদুবলে নিজেকে একটা পায়রায় বদলে নিল, আর তারপর পায়রা হয়ে গভীর জংগল উড়ে পার হয়ে গেল। উড়তে উড়তে সে এক বিরাট মাঠের উপর এসে থামল। মাঠটা এত বিরাট ছিল যে তার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত দেখতেই পাওয়া যায় না। ছেলেটা সেইসব দেখে তক্ষুণি নিজেকে ঘোড়ায় পরিণত করে ফেলল, আর ঘোড়া হয়ে চক্ষের পলকে, দৌড়ে বিরাট মাঠটা পার হয়ে গেল। ঘোড়া তো মাঠ পার হয়ে ছুটতে ছুটতে চলেছে। ছুটতে ছুটতে সেই ঘোড়া, এক বিরাট প্রাসাদের সামনে এসে পৌঁছাল, তখন ঘোড়া নিজেকে আবার মানুষে বদলে নিল। ছেলেটা খবর নিয়ে জানল সেটা সিংহ গড়ের রাজপ্রাসাদ।
এরপর সে কি করবে এই চিন্তা করতে করতে শেষে ঠিক করল যে এই রাজার কাছেই সে থেকে যাবে, যদি রাজা তাকে

কোন কাজ দেয়। এই ভালমানুষ ছেলেটাকে দেখে রাজার ভাল লাগল, তাই রাজা তাকে নিজের কাছেই রেখে দিলেন। এর কিছুদিন পর সিংহগড়ের রাজা তার বন্ধু দূরদেশী রাজার সঙ্গে দেখা করার জন্য রওনা হলেন। সঙ্গে ভালমানুষ ছেলেটাকেও নিলেন যদি কোনও কাজে লাগে।

এই দূরদেশী রাজার একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে ছিল। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে কত যে রাজকুমার তাকে বিয়ে করবার স্বপ্ন দেখত, তার আর হিসেব নেই। বোকা ছেলেটাও রাজকন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু মনে মনে ভাবল,—রাজকুমার-রাই রাজকন্যাকে বিয়ে করতে পারছে না, আর তার মত গরীব ছেলে কি করে রাজকন্যাকে বিয়ে করতে পারবে? তাই মনে দুঃখ নিয়ে ভালমানুষ বোকা ছেলেটা দূরদেশী রাজার রাজ্যে থেকে গেল।

একদিন দূরদেশী রাজার রাজ্যে এক দারুণ দুঃসংবাদ এসে পৌঁছাল। সিংহগড়ের রাজ্য রাক্ষস রাজা আক্রমণ করে তছ্‌নছ্‌ করছে। আর দিনকয়েকের মধ্যে সিংহগড় জয়ও করে নেবে। সেই কথা শুনে সিংহগড়ের রাজা ভয়ে পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। তবুও সিংহগড়ের রাজা নিজের রাজ্যে সেই মুহূর্তেই ফিরে যাবেন স্থির করলেন। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবেন যে রাক্ষস রাজার হাত থেকে সিংহগড়কে বাঁচান যায় কিনা।

সব শুনে দূরদেশী রাজা বল্লেন, তিনি কিছুতেই সিংহগড়ের রাজাকে একলা রাজ্যে ফিরে যেতে দেবেন না। সবাই জানে রাক্ষস রাজার কি প্রচণ্ড শক্তি। আর কি হিংস্র সে! তাই এইসময় সেখানে রাক্ষস রাজার মুখোমুখি হওয়া যে কতটা ভয়ের ব্যাপার সবাই জানে। সেজন্য দূরদেশী রাজা সিংহগড়ের রাজাকে সাহায্য করার জন্য বল্লেন—"আমিও তোমার সঙ্গে তোমার রাজ্যে যাব।"

সিংহগড়ের রাজা আর দূরদেশী রাজা বোকা ভালমানুষ ছেলেটাকে নিয়ে তিনদিন-তিনরাত একভাবে চলতে চলতে নিজের রাজ্য সিংহগড়ে এসে পৌঁছালেন। রাজ্যে পৌঁছাবার পর রাক্ষস রাজার সৈন্য-সামন্ত, ঘোড়া-হাতি, লোক-লস্কর সব দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সিংহগড়ের রাজা বুঝতে পারলেন যে তার রাজ্যকে বাঁচাবার আর কোন উপায়ই নেই।

এত কাণ্ড দেখে দূরদেশী রাজা বল্লেন—"আহা! আমার সেই যাদু তলোয়ারটা যদি সঙ্গে আনতাম, তাহলে আমি একলাই রাক্ষস রাজার সৈন্য-সামন্তকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারতাম। কিন্তু সেই তলোয়ারটা ঠিক সময়ে পাই কি করে? আমার রাজ্যে পৌছাতে তো তিনদিন-তিনরাত লেগে যাবে। সেখানে পৌঁছে রাজকন্যাকে বুঝিয়ে তলোয়ারটা নিয়ে আসতে হবে।" দূরদেশী রাজার মনটা এইসব চিন্তায় খারাপ হয়ে গেল।

কিছু ভেবে দূরদেশী রাজা বল্লেন—"কেউ যদি কাল সকালের মধ্যে সেই যাদু তলোয়ারটা এনে দিতে পারে তাহলে হয়ত—সিংহগড়কে বাঁচানো যাবে। আর এই অসম্ভব কাজ কেউ যদি করতে পারে, তবে আমি সেই সাহসী ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেব।"

বোকা ছেলেটা এই কথাটা শুনতে পেল। সঙ্গে সঙ্গেই ভাবল দূরদেশী রাজকন্যাকে পাবার এই একমাত্র উপায়। ছেলেটা আর এক মুহূর্তও নষ্ট না করে দূরদেশী রাজ্যের দিকে রওনা হয়ে গেল। যেখানে রাস্তা আছে সেখানে ঘোড়া হয়ে জোর কদমে ছুটল, যেখানে জঙ্গল পেল সেখানে পায়রা হয়ে চক্ষের পলকে জঙ্গল পার হয়ে গেল, আর নদী পেলে মাছ হয়ে সহজেই নদী পার হয়ে গেল। এক মুহূর্ত বিশ্রাম না করে তিনদিন-তিনরাতের পথ সে পার হয়ে এল কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। আর রাত্রির মধ্যেই দূরদেশী রাজ্যে পৌঁছে গেল। সেখানে

পৌঁছে দূরদেশী রাজকন্যার কাছে গিয়ে দূরদেশী রাজার কথা সবিস্তারে বল্ল।

এই অল্প সময়ের মধ্যে এতটা পথ আসতে ছেলেটা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তবুও বিশ্রাম না করে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্ল—"আপনার বাবার যাদু তলোয়ারটা আমায় দিন কাল সকালের মধ্যেই এটা সিংহগড়ে দূরদেশী রাজার হাতে পৌঁছে দিতে হবে। আর তা না হলে সিংহগড়ের রাজা আর দূরদেশী রাজা দুজনেই রাক্ষস রাজার হাতে বন্দী হয়ে যাবেন।"

রাজকন্যা তো সব শুনে অবাক্। শেষে বল্ল—"সকালের মধ্যে কিছুতেই তুমি সেখানে পৌঁছাতে পারবে না। সিংহগড় বহুদূরের রাস্তা। পৌঁছাতে তিনদিন-তিনরাত লেগে যাবে।"

ছেলেটা বল্ল—"আপনার কথা সত্যি হলেও আমি এই অসম্ভব কাজ করতে পারি। আমার অদ্ভুত যাদু শক্তি আছে। তার ফলে আমি কখনও ঘোড়া হয়ে দৌড়াব, কখনও বা পায়রা হয়ে উড়ব, কখনও বা মাছ হয়ে নদী পার হয়ে যাব। বিশ্বাস করুন রাজকন্যা, আমি আজ রাত্রির মধ্যেই সিংহগড়ে পৌঁছে যাব।"

এই অসম্ভব কথা রাজকন্যা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইল না। রাজকন্যা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না কি করে একটা লোক ঘোড়া হয়ে দৌড়াবে, পায়রার মত উড়বে, কিংবা মাছ হয়ে নদী পার হবে।

রাজকন্যা বিশ্বাস না করায় রাজার যাদু তলোয়ারটাও ছেলেটা পাচ্ছিল না। এদিকে সময়ও ক্রমে পার হয়ে যাচ্ছে। ছেলেটা তখন আর কি করে! রাজকন্যাকে বলল—"বেশ, দেখুন আমি কি করে এই অসম্ভব কাজ সম্ভব করতে পারি। আমার হাতে সময় যদিও বেশী নেই, তবুও আপনাকে বিশ্বাস করাতে

না পারলে যাদু তলোয়ারটাতো আর পাব না। ঠিক আছে, তাহলে যদি আমি আমার যাদু দেখাই, আর তার বদলে যাদু তলোয়ারটা পাই, সেটাকে আজকের মধ্যেই সিংহগড়ে পৌঁছে দিতে পারি, তবে রাজকন্যা, স্বীকার করুন আপনি আমায় বিয়ে করতে রাজী হবেন।"

রাজকন্যা ভাবল এটা যখন অসম্ভব কাজ তখন এতে রাজী হতে আর আপত্তি কি। তাই রাজকন্যা ছেলেটার এই প্রস্তাব মেনে নিল।

তখন ছেলেটা যাদু বলে ঘোড়া হয়ে গেল। তারপর অনুনয় করে রাজকন্যাকে বলল—"লক্ষ্মী রাজকন্যা, আমার কেশর থেকে তিনটে লোম তুলে সাবধানে লুকিয়ে রাখুন। পরে হয়ত কাজে লাগবে।"

রাজকন্যা তাই-ই করল। তারপর ছেলেটা ঘোড়া থেকে আবার মানুষ হল। এরপর ছেলেটা নিজেকে বদলে ফেলল পায়রায়। তারপর অনুনয় করে রাজকন্যাকে বলল—

"লক্ষ্মী রাজকন্যা, আমার ডানা থেকে তিনটে পালক তুলে সাবধানে লুকিয়ে রেখে দিন। পরে হয়ত কাজে লাগবে।"

রাজকন্যা ঠিক তাই করল। তারপর ছেলেটা রাজকন্যার চোখের সামনে পায়রা থেকে আবার মানুষে পরিণত হল। এরপর সব শেষে, যাদুবলে আবার সে মাছ হয়ে গেল। তারপর মাছটা অনুনয় করে রাজকন্যাকে বলল—"লক্ষ্মী রাজকন্যা, আমার গা থেকে তিনটে আঁশ তুলে নিয়ে সাবধানে লুকিয়ে রেখে দিন। পরে হয়ত কাজে লাগবে।"

রাজকন্যাও ঠিক তাই করল। তারপর রাজকন্যার চোখের সামনে মাছ থেকে আবার সে মানুষে পরিণত হল।

রাজকন্যা ছেলেটার এই অপূর্ব যাদুশক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। রাজার যাদু তলোয়ারটা ছেলেটাকে দিতে এবার রাজকন্যা

আর কোন আপত্তিই করল না। রাজকন্যা যাদু তলোয়ারটা ছেলেটাকে দিয়ে বলল—"এই অপূর্ব যাদু-কৌশল যে করতে পারে সে কিছুতেই সাধারণ মানুষ নয়। আমি কোনও রাজকুমারকে বিয়ে করতে চাইনি কখনও, আমি বিয়ে করতে চেয়েছি তাকে, যার অসীম শক্তি আছে। আজ তোমার যাদু দেখে আমি মুগ্ধ। তাই তোমাকেই বিয়ে করব ঠিক করলাম।"

বোকা ভাল ছেলেটাও বলল—"তোমাকে প্রথম দেখার পর থেকেই আমার ইচ্ছে ছিল তোমার মত অপূর্ব সুন্দরী রাজকন্যা বিয়ে করি। আজ তুমি আমায় বিয়ে করতে চাওয়ায় আমিও খুব খুশী।"

তারপর দুজনে দুজনকে বিয়ে করবে এই প্রতিজ্ঞা করবার পর ছেলেটা যাদু তলোয়ারটা নিয়ে সিংহগড়ের দিকে রওনা হয়ে গেল।

কখনও ঘোড়া হয়ে মাঠের উপর দিয়ে দৌড়ে, কখনও পায়রা হয়ে বন-জঙ্গলের উপর দিয়ে উড়ে, কখনও বা মাছ হয়ে নদী সাঁতরে পার হয়ে সেইদিন রাত্রেই ছেলেটা সিংহগড়ে পৌঁছে গেল।

সিংহগড়ের রাজপ্রাসাদে সে সময় কোন সৈন্য-সামন্ত, লোকজন কিছুই ছিল না। সবাই রাক্ষস রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজ্যের সীমান্তে চলে গেছে। শুধুমাত্র রাজপ্রাসাদের প্রধান পাহারাদারই প্রাসাদে ছিল। সেই প্রধান পাহারাদার লোকটা ধূর্ত্ত ও খুব পাজী লোক ছিল। সেই তখন ভালমানুষ ছেলেটার সামনে এসে দাঁড়াল।

এই পাহারাদার লোকটাও কিন্তু দূরদেশী রাজার কথাগুলো শুনেছিল। সেও জানতো যাদু তলোয়ারটা যে আনতে পারবে দূরদেশী রাজ্যের রাজকন্যাকে সেই বিয়ে করতে পারবে। তাই ধূর্ত্ত প্রধান পাহারাদার বোকা ছেলেটাকে ভালমানুষের মত

জিজ্ঞেস করল—"তোমার মত পলকা ছেলে এই ভারী বিরাট তলোয়ারটা এনেছ একথা বলছ বটে, কিন্তু এই ভারী তলোয়ারটা তুমি তুলে এনেছ, এ কথা কেউই বিশ্বাস করবে না। আমার যা শক্তি আছে তাই দিয়ে আমিই তলোয়ারটাকে খাপ থেকে বার করতে পারব না। আমার বিশ্বাস, তুমিও সেটা পারবে না।"

বোকা ছেলেটা রেগে বলল—"কি, এই কথা বলছ তুমি? আমি যে তলোয়ারটা এনেছি এটা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ—" এই বলে খাপ থেকে তলোয়ারটা খুলে বোকা ছেলেটা তলোয়ারটা প্রধান পাহারাদের হাতে দিল।

ধূর্ত্ত প্রধান পাহারাদারতো এটাই চাইছিল। যাদু তলোয়ারটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষের পলকে, ছেলেটা কিছু বোঝবার আগেই তার মাথাটা কেটে ফেলল। তারপর কাটা মাথা আর দেহটা টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে প্রাসাদের পেছনের জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এল। ধূর্ত্ত প্রধান পাহারাদার তখন শুধু সকাল হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

সকাল হলে সিংহগড়ের রাজা আর দূরদেশী রাজা যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এল তখন প্রধান পাহারাদার দূরদেশী রাজার সামনে গিয়ে বলল—"এই দেখুন রাজা, আপনার যাদু তলোয়ারটা আমি নিয়ে এসেছি।"

দূরদেশী রাজা যাদু তলোয়ারটা পেয়ে তো খুব খুশী। দূরদেশী রাজা তখন সেই প্রধান পাহারাদারকে বললেন—"সত্যিই তুমি খুব বুদ্ধিমান আর সাহসী লোক। তোমার মত সাহসী ভালো লোকের হাতে রাজকন্যাকে দিতে আমার কোনও আপত্তি নেই।"

দূরদেশী রাজা তারপর তার যাদু তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হয়ে গেলেন। আর শত্রুসৈন্য কিছু বোঝবার আগেই ঐ যাদু তলোয়ারের সাহায্যে নিমেষের মধ্যে শত্রুসৈন্যকে নিশ্চিহ্ন

করে দিলেন। যাদু তলোয়ারের আগুনের ফুলকিতে রাক্ষস রাজার সৈন্য সামন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল। রাক্ষস রাজাও ভয়ে সিংহগড়ের সীমানা ছেড়ে পালিয়ে গেল।

এরপর সিংহগড়ের রাজ্যে আনন্দের জোয়ার বইতে শুরু করল। পরের দিনই দূরদেশী রাজা সেই ধূর্ত্ত পাহারাদারকে সঙ্গে নিয়ে নিজের রাজ্যে রওনা হয়ে গেলেন। সবাইতো ধূর্ত্ত পাহারাদারটার জয়গান গাইতে লাগল। সবাই বলল, সেই পাহারাদারটা যদি যাদু তলোয়ারটা ঠিক সময়ে না আনতে পারত তবে রাক্ষসরাজের সৈন্যসামন্ত তাদের শেষ করে দিত। তাই পাহারদারটা দূরদেশী রাজকন্যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে শুনে সবাই খুশীই হল।

এদিকে ঐ বোকা ভালোমানুষ ছেলেটা সিংহগড়ের প্রাসাদের পেছনের জঙ্গলে মরে পড়ে আছে। দূরদেশী রাজা নিজের রাজ্যে রওনা হয়ে যাওয়ার দু দিন পর সেই ভিন্‌দেশী যাদুকর সিংহগড়ের রাজপ্রাসাদের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় ভিন্‌দেশী যাদুকর ভালোমানুষ বোকা ছেলেটাকে মরা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখল। মাথা কাটা, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। এসব দেখে তো যাদুকর আশ্চর্যই হল। বোকা ছেলেটার তিনটি যাদুশক্তি আছে, তবুও এটা কেমন করে হল বোঝবার জন্য যাদুশক্তি প্রয়োগ করল। তখন কি ঘটেছে সবই সেই যাদুকর জানতে পারল।

তখন সেই যাদুকর মন্ত্রবলে একটা বাজপাখী তৈরী করল আর বাজপাখীকে অচিন দেশের সীমানা থেকে জীবনসাগরের মন্ত্রপূত জল আনতে পাঠাল। যাদু বাজপাখী চক্ষের নিমেষে উড়ে গিয়ে সুদূর দেশ থেকে মন্ত্রপূত জল নিয়ে এল। ভিন্‌দেশী যাদুকর মন্ত্রপূত জল মরা ভালোমানুষ ছেলেটার গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বলে উঠল—"হিং টিং ছট্, মুণ্ডু কাটা ভালো ছেলে

আবার জ্যান্ত হ, হিং-টিং-ছট্।”
কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মরা ছেলেটার মুণ্ডুটা জোড়া লেগে গেল, চোখ খুলে উঠে বসল সে।
যাদুকর ভালোমানুষ ছেলেটার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল—“তুমি সত্যিই বোকা ছেলে। ভালোমানুষ হলে কি বোকা হতে হয়? তুমি যাদু তলোয়ারটা আনবার পর ধূর্ত্ত পাহারাদারটার হাতে দিলে কেন? না, আর দেরী নয়। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে রওনা হও। ঘোড়া হয়ে, পায়রা হয়ে, মাছ হয়ে যত তাড়াতাড়ি পার দূরদেশী রাজকন্যার কাছে চলে যাও। তা নাহলে ঐ ধূর্ত্ত পাহারাদারটার সঙ্গেই কাল সকালে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে যাবে।’
বোকা ছেলেটা এবার সব কিছু বুঝতে পেরেছে। সে ভিন্‌দেশী যাদুকরকে বারবার ধন্যবাদ জানিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই দূরদেশী রাজ্যের দিকে রওনা হয়ে গেল।
তিনটে যাদুশক্তির সাহায্যে সে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই দূরদেশী রাজার প্রাসাদে পৌঁছে গেল। দূরদেশী রাজপ্রাসাদের চারিদিকে তখন আনন্দ হৈ-চৈ চলছে! কারণ, দূরদেশী রাজ-কন্যার অবশেষে বিয়ে হচ্ছে। সবাই ভালো ভালো জামা-কাপড় পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সবার মুখে হাসি। রাজকন্যার মুখে হাসি নেই, মনে আনন্দ নেই। সে একলা চুপচাপ ঘর বন্ধ করে বসে আছে। ভালোমানুষ ছেলেটা রাজার সঙ্গে ফিরে না আসায় তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হবে না, এজন্য রাজকন্যার দুঃখের শেষ নেই।
বোকা ছেলেটা সেই সময় রাজকন্যার জানালার পাশে গিয়ে রাজকন্যাকে ডাকল। ভালোমানুষ ছেলেকে দেখতে পেয়ে রাজ-কন্যার আর আনন্দ ধরে না। রাজকন্যা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ভালোমানুষ ছেলেকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল।

ছেলেটা রাজকন্যাকে সমস্ত ঘটনা বলল। রাজকন্যা তখন ভালোমানুষ ছেলেকে রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে রাজাকেও সব কিছু ঘটনা বলল। ভালোমানুষ ছেলেকে বেঁচে ফিরে আসতে দেখে ধূর্ত্ত পাহারাদারতো ভয়ে চুপ। দূরদেশী রাজা কিন্তু এসব কথা একটুও বিশ্বাস করতে চাইল না। ধূর্ত্ত পাহারাদারটাও বলল, সেই রাজকন্যার কাছে এসে যাদু তলোয়ার নিয়ে গেছে, ঐ ছেলেটা নয়। রাজাও মহাবিপদে পড়লেন। রাজকন্যার কথা মেনে নেবেন, না পাহারাদারের কথা বিশ্বাস করবেন!

তখন রাজকন্যা ধূর্ত্ত পাহারাদারকে বলল—"তুমিই যদি আমার কাছ থেকে যাদু তলোয়ার নিয়ে গিয়ে থাক, তবে তলোয়ারটা নেবার আগে তুমি যে যাদুগুলো দেখিয়েছিলে আবার সেগুলো দেখাও।"

দূরদেশী রাজা জানতে চাইলেন—কি সে যাদু?

রাজকন্যা বললে—"তুমি এখনই একবার ঘোড়া হও, তারপর পায়রা হও, তারপর মাছ হও, আর সব শেষে আবার মানুষ হয়ে যাও।"

রাজকন্যার কথা শুনে সবাই বুঝল এটা একটা অসম্ভব মজার কথা। এসব করা কোনও মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। সবাই তো ধূর্ত্ত পাহারাদারের দিকে তাকিয়ে আছে, সে কি করে দেখবার জন্য।

রাজকন্যার কথা শুনে ধূর্ত্ত পাহারাদার হেসে বলল—"রাজকন্যা তুমি আমাকে নিয়ে মজা করার জন্য এসব কথা বলছ। পৃথিবীতে কোন মানুষই এসব কাজ করতে পারে না।"

রাজকন্যা বলল—"ঠিকই বলেছ, তোমার মত সাধারণ মানুষ পারে না। পারে সেই মানুষ, যার তিনটে যাদুশক্তি আছে।"

তখন রাজকন্যা ভালোমানুষ ছেলেকে সবার সামনে নিয়ে এল।

তারপর ছেলেটা রাজকন্যার অনুরোধে চোখের পলকে ঘোড়া হয়ে গেল। রাজকন্যা তার কেশর থেকে তিনটে লোম তুলে নিল। তারপর সে পায়রা হয়ে আকাশে উড়ে এল। রাজকন্যা তার পালক থেকে তিনটে পালক তুলে নিল। সব শেষে সে মাছ হবার পর রাজকন্যা তার গা থেকে তিনটে আঁশ তুলে নিল। সবশেষে ছেলেটা আবার মানুষ হল। ছেলেটার এই এই অপূর্ব্ব ক্ষমতা দেখে সবাই তো অবাক্।

রাজকন্যা তখন তার লুকানো জায়গা থেকে আগের তোলা ঘোড়ার লোম, পায়রার পালক, মাছের আঁশ নিয়ে এসে সবাইকে দেখাল। সবাই এবার বুঝতে পারল রাজকন্যাই সত্যি কথা বলছিল। সবাই বুঝল বোকা ছেলেটাই সত্যিকারের যাদুশক্তির অধিকারী আর পাহারাদারটা ঠগ, বদমাইশ।

দূরদেশী রাজা ধূর্ত্ত পাহারাদারকে তখন শূলে চড়িয়ে মেরে ফেলার ,আদেশ :দিলেন। আর তারপর খুব ধূমধাম করে ভালোমানুষ ছেলেটার সঙ্গে দূরদেশী রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়েতে সিংহগড়ের রাজাও এসে হাজির হলেন, আর ছেলেটাকে অনেক ধন-দৌলত উপহার দিলেন।

এরপর আর কেউ ছেলেটাকে বোকা ছেলে বলে ডাকে না, সবাই বলে শক্তিধর ছেলে। শক্তিধর ছেলে আর দূরদেশী রাজকন্যা বিয়ের পর সুখে ঘরকন্না করতে লাগল।

চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না, ভাল কাজের পুরস্কার সব সময়েই আছে, শক্তিধর ছেলেটি কাজের মধ্য দিয়ে এ কথা প্রমাণ করল
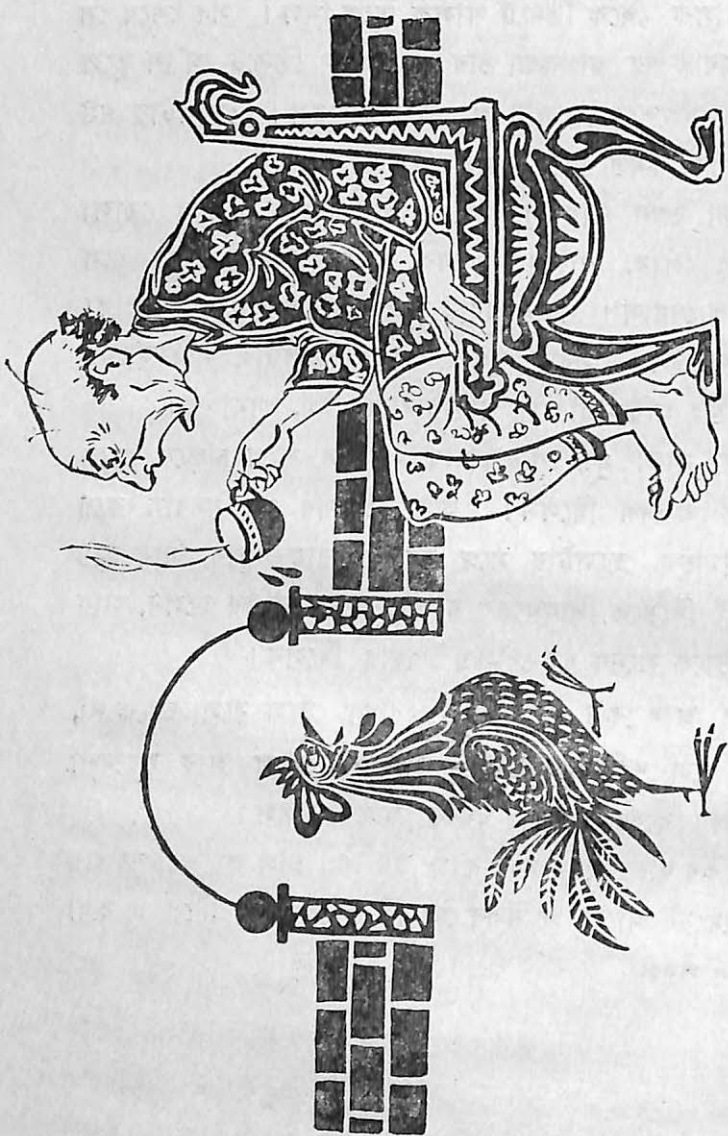
"কোঁকর-কোঁ-কোঁ—জমিদার—সাবধান হও।"

সাহসী মোরগের কথা

বহুদিন আগে এক জমিদারের রাজ্যে এক গরীব লোক বাস করত। তার জমি-জমা, টাকা-পয়সা কিছুই ছিল না। বাড়ি-ঘর এসবতো ছিলই না। জমিদারের কাছে দিন-মজুরের কাজ করে কোনও রকমে তার দিন চলে যেত। জমিদারের সেই রাজ্যে লোকদের থাকবার জন্য অনেক ছোট-ছোট পান্থশালা ছিল। গরীব লোকটা জমিদারের কাছে চেয়ে-চিন্তে একটা পান্থশালায় বিনি পয়সায় থাকবার অনুমতি পেয়েছিল। জমিদার কিন্তু বার বদলে গরীব লোকটাকে কোনও বেশী পয়সাকড়ি না দিয়ে আরও বেশী করে খাটাতেন। তবুও গরীব লোকটা এতেও খুশী ছিল, হাজার হোক, বিনি পয়সায় পান্থশালায় জমিদার থাকতে দিয়েছেন। সেজন্য সে জমিদারকে ধন্যবাদও জানাত।

ঐ গরীব লোকটার একটা মোরগ ছিল। লোকটার কোনও ছেলেমেয়ে না থাকায় সে ঐ মোরগটাকে ছেলের মত ভালবাসত। মোরগটাই ছিল তার সব কিছু। গরীব ভালমানুষ লোকটা মোরগের সঙ্গে কথা বলে তার অবসর সময় আনন্দেই কাটাত। মোরগটাও লোকটাকে খুব ভালবাসত। জমিদারের পান্থশালায় ভালমানুষ লোকটা আর তার মোরগের বেশ আনন্দেই দিন কেটে যাচ্ছিল।

জমিদার কিন্তু কারুর ভালই দেখতে পারতেন না। জমিদার

মাঝে-মাঝেই গরীব লোকটার ওপর নানান রকমের অত্যাচার করতেন। তবুও গরীর লোকটা সব কিছুই হাসিমুখে সহ্য করত। কিন্তু জমিদার একদিন বিনা কারণে ভালমানুষ গরীব লোকটাকে মেরে পান্থশালা থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

গরীব লোকটা কি আর করে। তার হয়ে অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে কথা বলবার সাহস কারুরই ছিল না। তাই গরীব লোকটার নিজের দুঃখে কাঁদা ছাড়া আর কিছু করারও উপায় রইল না। সে তার মোরগটাকে নিয়ে অন্য রাজ্যের দিকে চলতে লাগল।

জমিদারের এই অন্যায় অত্যাচার দেখে মোরগ কিন্তু খুবই রেগে গেছে। আর ভালমানুষ মনিবের জন্য মোরগটার খুব দুঃখও হল। সে তখন ভালমানুষ মনিবকে বলল—"তুমি এর জন্য দুঃখ করো না। আমি জমিদারের কাছে যাচ্ছি। তোমার জন্য যা বলার, যা করার, সব কিছুই আমি করব। তুমি সে কদিন এখানকার গাছতলায় কোনও রকমে অপেক্ষা কর।"

তারপর মোরগ জমিদারের বাড়ির দিকে চলতে শুরু করল। যেতে যেতে পথে ভালুকের সঙ্গে মোরগের দেখা হল।

মোরগটা বলল—"এই যে ভালুক ভাই, সুপ্রভাত।"

ভালুকটাও বলল—"কি খবর? এত তাড়াতাড়ি ছুটছ কোথায়?"

"আমি জমিদারের কাছে যাচ্ছি। জমিদার আমার মালিকের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। সেজন্য জমিদারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যাচ্ছি।"

ভালুক বলল—"চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই। দেখি, তোমাকে যদি কোনও ভাবে সাহায্য করতে পারি।"

মোরগ আর ভালুক দুজনে যেতে যেতে পথে আবার দেখা হল নেকড়ে বাঘের সঙ্গে।

নেকড়কে দেখেই মোরগটা বল্ল—"এই যে নেকড়ে ভাই,

সুপ্রভাত।”
নেকড়ে বাঘটাও বল্ল—“কি খবর মোরগ? ভালুকমশাইকে নিয়ে এত তাড়াতাড়ি ছুটছ কোথায়?”
“আমি জমিদারের কাছে যাচ্ছি। জমিদার আমার মালিকের সংগে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। সেজন্য জমিদারের সংগে বোঝাপড়া করতে যাচ্ছি।”
নেকড়ে বলল—“চল, আমিও তোমার সংগে যাই। দেখি তোমাকে যদি কোনও ভাবে সাহায্য করতে পারি।”
তখন মোরগ, ভালুক আর নেকড়ে এই তিনজনে এক সংগে জমিদারের বাড়ির দিকে চলতে লাগল। যেতে যেতে, পথের মধ্যে আবার এক বাজপাখী উড়ে এসে তাদের মাঝখানে হাজির হল। বাজপাখীকে দেখে মোরগ বলল—
“এই যে বাজপাখী ভাই, সুপ্রভাত।”
বাজপাখী বলল—“কি খবর মোরগ? ভালুকমশাই আর নেকড়ে ভাইকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুট্‌ছ কোথায়?”
“আমি জমিদারের কাছে যাচ্ছি। জমিদার আমার মালিকের সংগে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। সেজন্য জমিদাদের সংগে বোঝাপড়া করতে যাচ্ছি।”
বাজপাখী বল্ল—“চল, আমিও তোমাদের সংগে যাই। দেখি তোমাকে যদি কোনও ভাবে সাহায্য করতে পারি।”
তখন মোরগ, ভালুক, নেকড়ে আর বাজপাখী সবাই মিলে জমিদারের বাড়ির দিকে চলতে লাগল। যেতে যেতে জমিদারের বাড়ির সামনে এসে পৌঁছাল। তখন ভালুক, নেকড়ে আর বাজপাখী জমিদারের বাড়ির পেছনের বাগানে লুকিয়ে রইল। আর মোরগ উড়ে জমিদারের বাড়ীর সদর ফটকের উপর এসে বসল। তারপর রাগে গর্‌গর্‌ করে ডাকতে লাগল আর বলতে লাগল,—“কোঁকড়-কোঁ-কোঁ, জমিদার তুমি আমার কথা শুনে

সাবধান হও। তুমি আমার ভালমানুষ মালিককে তার থাকবার জায়গা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ। তাকে অত্যাচার করেছ। তাই আমিও তোমাকে তোমার বাড়ি থেকে তাড়াব। তোমার জমিদারী কেড়ে নেব। তুমি সাবধান হও। কোঁকড়-কোঁ-কোঁ।"

জমিদার তখন তার দোতলার বারান্দায় বসে সকালের জলখাবার খাচ্ছিলেন। মোরগের এইসব কথা শুনে তার খুব রাগ হল। রেগে গিয়ে লোকজনদের বল্ল—"যাও, মোরগটাকে ধরে এক্ষুণি রাজহাঁসদের ঘরের মধ্যে রেখে এস। পোষা রাজহাঁসরা ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে মোরগকে মেরে ফেলবে।"

জমিদারের লোকরা মোরগকে ধরে রাজহাঁসদের ঘরের মধ্যে ফেলে দিল। রাজহাঁসরা মোরগটাকে যখন মারতে এল, মোরগ উড়ে রাজহাঁসদের পিঠে বসল, আর তারপর ধারালো ঠোঁট দিয়ে ঠুক্‌রে রাজহাঁসদের এক এক করে মেরে ফেল্ল। সেই লড়াই-এ সমস্ত রাজহাঁসদের মেরে মোরগ পালিয়ে এল।

পরের দিন সকালে মোরগটা আবার জমিদারের সদর ফটকের উপর বসে ডাকতে লাগল, আর বলতে লাগল—

"কোঁকড়-কোঁ-কোঁ, জমিদার তুমি আমার কথা শুনে সাবধান হও। তুমি আমার ভালমানুষ মালিককে তার থাকবার জায়গা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ। তাকে অত্যাচার করেছ। তাই আমিও তোমাকে তোমার বাড়ি থেকে তাড়াব। তোমার জমিদারী কেড়ে নেব। তুমি সাবধান হও। কোঁকড়-কোঁ-কোঁ।

জমিদার তখন তার দোতলার বারান্দায় পায়চারী করছিলেন। মোরগের চিৎকার শুনে তিনি বুঝতে পারলেন রাজহাঁসরা মোরগকে মারতে পারে নি। তাই জমিদারের আরও বেশী রাগ হল। তিনি লোকজনদের বল্লেন—

"মোরগটাকে ধরে গরু-মোষের গোয়ালের মধ্যে ফেলে দিয়ে এস। গরু আর মোষেরা তাদের ধারালো শিং আর পায়ের খুর দিয়ে সহজেই মোরগটাকে মেরে ফেলবে।" জমিদারের লোকজনরা মোরগকে ধরে গরু-মোষের গোয়ালের মধ্যে ফেলে এল। জমিদারও এবার নিশ্চিন্ত হল।

মোরগকে গোয়ালের মধ্যে ফেলে দিতে দেখে নেকড়ে বল্লে—"মোরগ ভাই-এর এবার সত্যিই বিপদ। আমার এবার কাজে নামবার সময় হয়েছে।" এই বলে নেকড়ে আস্তে আস্তে গোয়ালের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সকালে গোয়ালের লোকজনরা এসে দেখে সমস্ত গরু-মোষরা মরে পড়ে আছে। ওদের গলায় নেকড়ের কামড়ের দাগ। আর মোরগটাও পালিয়ে গেছে। তারা অনেক খুঁজেও মোরগটাকে দেখতে পেল না। ভাবল, নেকড়ে বুঝি মোরগটাকেও খেয়ে ফেলেছে। জমিদারের লোকজনরা তখন নিশ্চিন্তে জমিদারের কাছে ফিরে গেল।

এদিকে পরের দিন সকালে সেই সাহসী মোরগ জমিদারের ফটকের ওপর বসে আবার ডাকতে লাগল আর বলতে লাগল—"কোঁকড়-কোঁ-কোঁ, জমিদার তুমি আমার কথা শুনে সাবধান হও। তুমি আমার ভালমানুষ মালিককে তার থাকবার জায়গা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ। তাকে অত্যাচার করেছ। তাই আমিও তোমাকে তোমার বাড়ি থেকে তাড়াব। তোমার জমিদারী কেড়ে নেব। তুমি সাবধান হও। কোঁকড়-কোঁ-কোঁ।"

জমিদার দোতলার বারান্দায় বসে জলখাবার খেতে খেতে এই কথা শুনে এবার খুব চিন্তিত হলেন। বুঝতে পারলেন যে তার গরু-মোষেরাও মোরগটাকে মারতে পারে নি। তাই ক্ষেপে গিয়ে লোকজনদের বল্লেন—

“যাও ঐ পাজী মোরগটাকে ধরে এক্ষুনি ঘোড়ার আস্তাবলের মধ্যে ফেলে দাও।
আমার তেজী ঘোড়ারা তাদের পায়ের ধারালো খুর দিয়ে মোরগটাকে সহজেই মেরে ফেলবে।”
—জমিদারের আদেশমত জমিদারের লোকেরা মোরগটাকে ধরে ঘোড়ার আস্তাবলের মধ্যে ফেলে দিল। ঐ আস্তাবলেই জমিদারের সব তেজী ঘোড়ারা থাকত।
জঙ্গলের ভেতর থেকে ভালুকতো সবকিছুই দেখতে পেল। তখন সে নেকড়ে আর বাজপাখীকে বল্ল—“মোরগ ভাই-এর এবার দেখছি আরও বেশী বিপদ। এবার আমার কাজে নামবার সময় হয়েছে”—এই বলে ভালুক আস্তে আস্তে আস্তাবলের মধ্যে ঢুকে পড়ল।
সকালে আস্তাবলের সহিস আস্তাবলে এসে দেখে সব ঘোড়া মরে পড়ে আছে। ভালুকের নখের বড় বড় দাগ রয়েছে সমস্ত ঘোড়াগুলোর দেহে। আর মোরগটাও পালিয়ে গেছে। লোক-জনরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মোরগকে পেল না। ভয়ে তারা জমিদারকেও এই খবরটা জানাতে সাহস পেল না। জমিদার তাই ভাবলেন, মোরগটা এবার মারাই গেছে। এই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে রাত্রে শুতে গেলেন।
এদিকে পরের দিন সকালে মোরগটা ঠিক অন্যদিনের মতই জমিদার বাড়ির ফটকের ওপর বসে আবার ডাকতে লাগল আর বলতে লাগল—
“কোঁকড়-কোঁ-কোঁ জমিদার তুমি আমার কথা শুনে সাবধান হও। তুমি আমার ভালমানুষ মালিককে তার জায়গা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ। তাকে অত্যাচার করেছ। তাই আমিও তোমাকে তোমার বাড়ি থেকে তাড়াব। তোমার জমিদারী কেড়ে নেব। আমি তোমার রাজহাঁস, গরু-মোষ, ঘোড়া

সবাইকেই মেরে ফেলেছি। তুমি সাবধান হও। এবার তোমার পালা। কোঁকড়-কোঁ-কোঁ। কোঁকড়-কোঁ-কোঁ।"

জমিদার আরাম করে, নিশ্চিন্তে বাড়ির ছাদে বসেছিলেন। মোরগের এই কথা শুনে আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না, রাগে ছাদ থেকে নেমে এসে বাড়ীর ফটকের উপর বসে থাকা মোরগটার দিকে দৌড়াতে লাগলেন আর চেঁচাতে লাগলেন,—

"ধর ধর ঐ পাজী মোরগটাকে। মেরে ফেল ঐ মোরগটাকে।"

জমিদারের চিৎকার শুনে জমিদারের সব লোকজন—পাত্রমিত্র জমিদারের ফটকের সামনের বাগানের দিকে ছুটে আসতে লাগল। এইসব দেখে মোরগটাও চিৎকার করে ডাকতে লাগল,—

"ভালুক ভাই, নেকড়ে ভাই, বাজপাখী ভাই, এস, সবাই এসো, জমিদারের লোকরা আমাকে মারতে আসছে।" চিৎকার শুনে ভালুক, নেকড়ে, বাজপাখী হৈ-হৈ করে জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে জমিদারের সদর ফটকের সামনে হাজির হল। তারপর সেকি সাংঘাতিক যুদ্ধ। জমিদারের সদর ফটকের সামনে ভালুক তার দাঁত আর ধারালো নখ দিয়ে সবার গলা কামড়ে মেরে ফেলতে লাগল। বাজপাখী তার ধারালো থাবা দিয়ে লোকজনদের ওপরে তুলে তুলে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল মাটিতে। আর মোরগটা তার ধারালো ঠোঁট দিয়ে লোকজনদের চোখ ঠুকরে তাদের অন্ধ করে দিতে লাগল। জমিদারের লোকজনেরা কেউ মারা পড়ল, কেউ বা ভয়ে বাড়ি ছেড়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেল।

শেষে জমিদার একদম একলা হয়ে পড়লেন। তখন মোরগটা উড়ে এসে জমিদারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠুকরে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। নেকড়ে, ভালুক আর বাজপাখী জমিদারকে ঘিরে ফেল্ল।

তখন মোরগ বল্ল—"জমিদার, এইবার আমরা তোমায় মেরে ফেলব। আর তারপর এই জমিদারির মালিক হবে আমার ভালমানুষ মালিক।"

জমিদার তখন ভয়ে হাতজোড় করে সাহসী মোরগকে বল্লেন—"নাঃ নাঃ তোমরা আমায় মেরো না, এই জমিদারী তোমরা নিয়ে নাও। আমি কিছু বলব না। তার বদলে যা করতে বলবে তাই করব।"

তখন মোরগ পরামর্শ করতে বসল ভালুক, নেকড়ে আর বাজ-পাখীর সংগে তারপর বল্ল—"ঠিক আছে, তুমি যদি আমার ভাল মানুষ মনিবের চাকর হয়ে থাকতে চাও তবে তুমি থাকতে পারবে। তা না হলে আমরা তোমায় মেরে ফেলব।"

অত্যাচারী জমিদারের তখন তো এই কথা না মেনে কোন উপায়ই রইল না।

এরপর সবাই মিলে ভালমানুষ মালিককে জমিদারের প্রাসাদের মধ্যে নিয়ে এল। পাজী জমিদার তখন ভালমানুষ লোকটার চাকর হয়ে বাড়ির নানান্ কাজ করতে লাগল।

ভালুক নেকড়ে বাজপাখী সেই জমিদারের বাগানের মধ্যেই থেকে গেল, আর নিশ্চিন্তে মনের সুখে ঘোরা ফেরা করতে লাগল। সাহসী মোরগ জমিদার বাড়ির ছাদে উঠে চারদিকে নজর রাখতে লাগল।

ভালমানুষ লোকটা মোরগ, ভালুক, নেকড়ে আর বাজপাখীকে নিয়ে সুখে সেই প্রাসাদে বসবাস করতে লাগল।

অত্যাচারীর পতন অনিবার্য, জমিদারই আবার সেটা প্রমাণ করল।

দয়ালু ছেলে আর চার বন্ধু

এক বৃদ্ধ সৎ লোকের একটি মাত্র ছেলে ছিল। বৃদ্ধ হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় কাজেও যেতে পারতেন না আর খাবার টাবার কিনেও আনতে পারতেন না। তার ছেলেকেই এসব কাজ করতে হত। বৃদ্ধের ছেলেও ছিল সৎ আর খুব দয়ালু। কোনও অন্যায় কাজ বা অন্যের অপকার এসব কিছুই সে করত না।

একদিন বাড়িতে খাওয়ার কোনও কিছু না থাকায় বৃদ্ধ বাপ ছেলেকে একটা টাকা দিয়ে বাজার থেকে রুটি কিনে আনতে বল্লেন। ছেলেটা ঐ টাকা নিয়ে রুটি কিনবার জন্য বাজারের দিকে রওনা হল।

বাজারে যেতে যেতে পথে ছেলেটা দেখতে পেল এক চাষী তার পোষা কুকুরকে বেত দিয়ে খুব মারছে। চাষী কুকুরকে এতই মারছে যে মনে হচ্ছে কুকুরটা বোধ হয় মরেই যাবে। কুকুরটার কষ্ট দেখে ছেলেটার খুব দুঃখ হল।

ছেলেটা তখন চাষীর কাছে গিয়ে বল্ল—"চাষী ভাই, তুমি কুকুরটাকে আর মেরো না। কুকুরটাকে ছেড়ে দাও। তার বদলে আমি তোমাকে না হয় এই টাকাটা দেব।"

চাষী এতে রাজী হয়ে কুকুরটাকে ছেড়ে দিল। ছেলেটাও চাষীকে টাকাটা দিয়ে বাড়িতে বাবার কাছে ফিরে গেল।

বাড়ির সদর দরজাতেই ছেলেটার জন্য তার বাবা অপেক্ষা করছিলেন। সেখানেই বাবার সংগে ছেলের দেখা হল। বাবা বল্লেন—
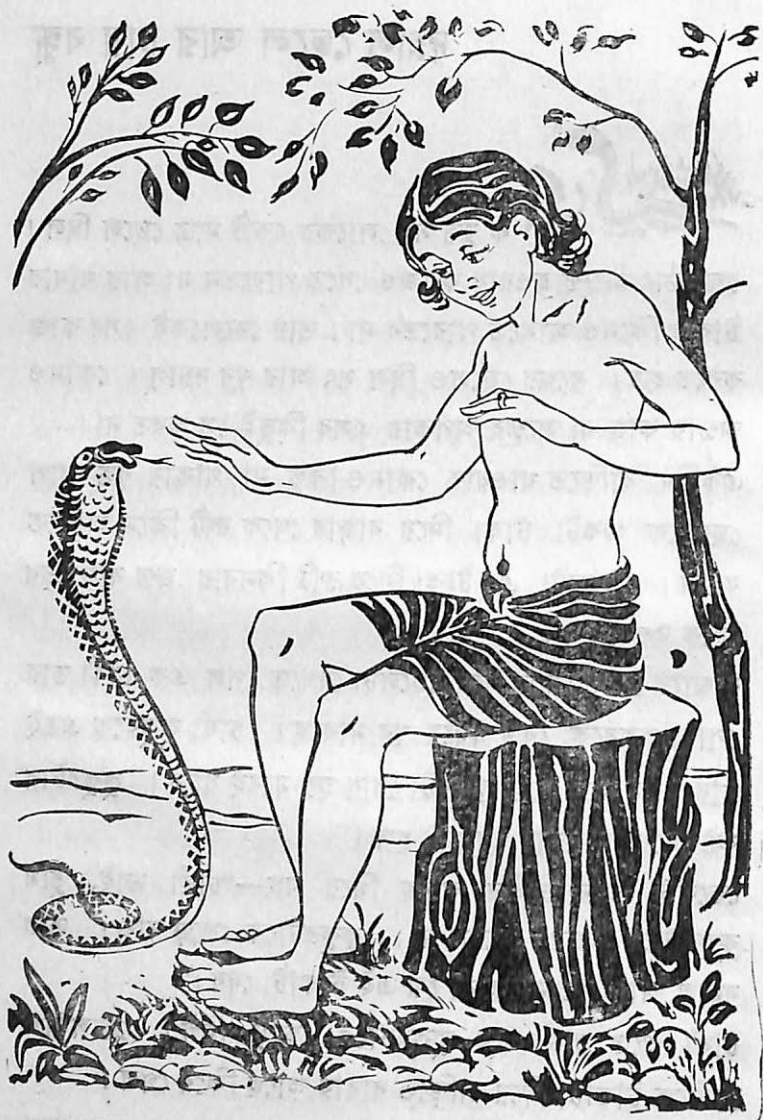
সাপ বল্ল—'তাই তোমাকে এই যাদু আংটি দিচ্ছি।'

"কিরে রুটি এনেছিস তো ?"

ছেলেটি উত্তর দিল—"নাঃ, আনি নি। মাত্র এক টাকায় কি রুটি হয় ? রুটি কিনতে হলে আরও টাকা চাই।"

ছেলেটি বাবাকে সঠিক বল্ল না যে সে টাকাটা খরচ করে ফেলেছে, আর কেনই বা খরচ করেছে। বাবাও এ নিয়ে ছেলেকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। কেননা ছেলেকে বাবা বিশ্বাস করতেন। বাবা জানতেন তার ভাল ছেলে কখনও খারাপ কাজ করতে পারে না। রুটি কিনে না আনায় সে রাত্রে বাবা ছেলের কারুরই খাওয়া জুটল না।

পরের দিন বাবা ছেলেকে আর একটা টাকা দিয়ে আবার রুটি কিনে আনবার জন্য বাজারে পাঠালেন। ছেলেটাও টাকা নিয়ে বাজারের দিকে রওনা হল।

বাজারে যাওয়ার পথে ছেলেটা দেখতে পেল যে সেই গত-কালকার চাষীটা এবার একটা ইঁদুরকে ধরে মারছে। মারের চোটে ইঁদুরটা প্রায় মরার মত হয়েছে। তাই দেখে ছেলেটার খুব কষ্ট হল। ছেলেটা তখন চাষীর কাছে গিয়ে বল্ল—

"চাষী ভাই, তুমি ইঁদুরটাকে আর মেরো না। ইঁদুরটাকে তুমি ছেড়ে দাও। তার বদলে না হয় আমি তোমাকে এই টাকাটা দেব।"

চাষী এতে রাজী হয়ে ইঁদুরটাকে ছেড়ে দিল। ছেলেটাও চাষীকে টাকাটা দিয়ে বাড়িতে বাবার কাছে ফিরে গেল।

ছেলের জন্য তো বাবা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। বাড়ির সদর দরজাতেই ছেলেটার সংগে বাবার দেখা হল। বাবা বল্লেন—"কিরে রুটি এনেছিস তো ?"

ছেলেটা ঠিক আগের দিনের মতই উত্তর দিল—"নাঃ, আনি নি। মাত্র একটা টাকায় কি হবে ? রুটি যদি কিনতেই হয় তবে আরও টাকা চাই।"

বাবা ছেলের কথায় তো খুব অবাক হয়ে গেলেন। তবুও ছেলের ওপর পুরো বিশ্বাস থাকায় সেদিনও ছেলেকে কিছু বল্লেন না। কিন্তু কি আর করা যাবে তখন! সমস্ত দোকান বন্ধও হয়ে গেছে। তাই সেদিনও বাবা আর ছেলে না খেয়ে থাকলেন।
তৃতীয় দিন সকালে বৃদ্ধ বাবা আরও একটা টাকা ছেলের হাতে দিয়ে বল্লেন—"আজকে কিন্তু নিশ্চয়ই রুটি আনবি। বাড়িতে খাবার মত কিছুই নেই। ছুদিন আমরা কিছু খাইও নি। আজ কিছু খাবার না পেলে আমি হয়ত মরেই যাব।
এরপর ছেলেটা বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাজারের দিকে রওনা হল। বাজারে যেতে যেতে পথে আবার সেই চাষীর সংগে দেখা হোল। চাষী তখন তার পোষা বিড়ালটাকে বেত দিয়ে প্রচণ্ডভাবে মারছে। সেই দৃশ্য দেখা ছেলেটার পক্ষে খুবই কষ্টকর হল।
ছেলেটা তখন আবার চাষীর কাছে গিয়ে বল্ল—"চাষী ভাই তুমি বেড়ালকে আর মেরো না। ছেড়ে দাও, তা না হলে ওতো মরেই যাবে। তার বদলে না হয় আমি তোমাকে এই টাকাটা দেব।"
চাষী ছেলের কথাতে এবারও রাজী হল। বেড়ালটাকে ছেড়ে দিল। ছেলেটাও চাষীকে টাকাটা দিয়ে বাড়িতে ফিরে গেল। আগের মতই বাড়ির সদর দরজাতে বাবা ছেলের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। ছেলেকে দেখে বল্লেন—
"কিরে, এবার রুটি এনেছিস্ তো?"
ছেলেটা কিন্তু এবারও বল্ল—"নাঃ, কি করে আনব? রুটি যদি কিনতেই হয় তো আরও টাকা চাই।"
রুটি না আনায় সেই তৃতীয় দিনেও বাবা-ছেলের কারুরই কিছু খাওয়া জুটল না। তবুও বাবার ছেলের ওপর ছিল অগাধ বিশ্বাস। তিনি জানতেন তার ছেলে সৎ, দয়ালু, কোনও অন্যায়

কাজ কখনও সে করে না। তাই ছেলেকে বকাবকি না করে চুপ করে থেকে তৃতীয় দিনটাও পার করে দিলেন।

চতুর্থ দিন সকালে বাবা ছেলেকে আর একটা টাকা দিয়ে রুটি আনতে বল্লেন। আর এও বল্লেন—এর পর রুটি না আনতে পারলে আর একটা টাকাও সে পাবে না, তাতে যদি দুজনকে উপোষ করে মরতে হয় হোক, তবুও এ কথার রদ-বদল হবে না। ছেলেটাতো চুপ করে বাবার কথা শুনল। তারপর টাকা নিয়ে বাজারে রওনা হয়ে গেল রুটি আনার জন্য। যেতে যেতে পথে আবার সেই চাষীর দেখা পেল। এবার সে দেখল চাষীটা একটা সাপকে মারছে। মারের চোটে সাপটা প্রায় আধমরা হয়ে গেছে। দয়ালু ছেলেটার এ কষ্ট দেখাও সহ্য হল না।

ছেলেটা চাষীকে গিয়ে বল্ল—"চাষী ভাই, তুমি সাপটাকে আর মেরো না, ছেড়ে দাও। তার বদলে না হয় আমি আমার এই শেষ টাকাটাও তোমাকে দেব। তার জন্য আমাকে আর বাবাকে যদি উপোষ করে মারাও যেতে হয় তো কোন ক্ষতি নেই।"

চাষী এতে রাজী হল। সাপটাকে ছেড়ে দিল, আর ছেলেটার কাছ থেকে তার শেষ টাকাটা নিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। ভাবল ছেলেটা কত বোকা, সে কুকুর, ইঁদুর, বেড়াল এসব সামান্য জন্তুর জন্য টাকাটাতো খরচা করলই, শেষকালে সাপের মত বিষাক্ত ভয়ংকর প্রাণীর জন্যও সে তার শেষ টাকাটা হাতছাড়া করল। ছেলেটার বোকামী দেখে সে মনে মনে না হেসে পারল না।

সাপটা কিন্তু ছেলেটার এত দয়া দেখে খুব খুশী হল। সে ছেলেটাকে একটু অপেক্ষা করতে বল্ল। তারপর গর্তের ভিতর তার বাসার মধ্যে থেকে একটি আংটি এনে ছেলেটাকে দিয়ে বল্ল, "তোমার দয়া দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। তাই তোমাকে এই

যাদু আংটি দিচ্ছি। যদি তোমার কোনও জিনিষের দরকার হয় তবে তোমার ডানহাতের মাঝের আঙ্গুলের মধ্যে আংটিটাকে কয়েকবার ঘোরাবে, আর যে জিনিষটা চাও, মনে মনে, একদমে তাই বলবে। দেখবে, যা চাইছ তাই-পাবে। আর যদি রুটি বা খাবারের জন্য, কিছু চাও তবে তোমার ঘরের জাঁতাকলের পাথরের গায়ে এটাকে তিনবার ঘসবে, আর মনে মনে একদমে রুটি বা খাবারের যা দরকার তাই বলবে। দেখবে তোমাদের দরকারের চেয়েও অনেক বেশী রুটি, ভালভাল খাবার পেয়ে যাবে। আমি আসলে সাপ নই, আমি এই পৃথিবীতে প্রকৃত দয়ালু খুঁজতে বেড়িয়েছিলাম। আর তোমাকেই প্রকৃত দয়ালু বুঝতে পেরে এই পুরস্কার দিয়ে যাচ্ছি।"—এই বলে সাপটা হঠাৎ দেবদূতের রূপ নিল। তারপর হাওয়ায় শূন্যে মিলিয়ে গেল।

ছেলেটা এইসব দেখে শুনে খুব খুশী হল দেবদূতকে মনে মনে নমস্কার জানাল। তারপর যাদু-আংটি ডান হাতের মাঝের আঙ্গুলে পড়ে বাড়িতে ফিরে এল।

আগের মতই বাড়ির সদর দরজার সামনে ছেলেটার জন্য তার বাবা অপেক্ষা করছিলেন। ছেলেটার সেদিন আসতে অন্যদিনের চেয়ে দেরী হওয়ায় চিন্তিতও হচ্ছিলেন। তাই ছেলেকে আসতে দেখে খুশী হয়ে বাবা বল্লেন—"কিরে এবার নিশ্চয়ই রুটি এনেছিস্? খালি হাতে ফিরিসনি ?"

ছেলেটা বল্ল—"নাঃ, রুটি আনি নি। তবে এক্ষুণি তুমি দেখবে আমরা দরকারের চেয়েও কত রুটি আর খাবার পেয়ে যাই।"

ছেলের এই কথা শুনে বাবাতো অবাক হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বাড়িতে এক টুকরোও রুটি নেই, ছেলেও কিছু আনে নি। তাই কোথা থেকে কিভাবে রুটি আর খাবার আসবে বাবা বুঝতে পারছিলেন না।

ছেলেটা আস্তে আস্তে বাড়ির জাঁতাকলের পাথরের গায়ে তিন বার যাদু আংটিটা ঘসল। আর কি আশ্চর্য! সংগে সংগেই ঘরের মধ্যে কত রকম দামী রুটির পাহাড় জমে গেল। ঘরের মেঝেতে থালার পর থালা কত রকম খাবার এসে পড়ল। বাবা তো এসব দেখে অবাক। বাবা ছেলে দুজনেই চারদিন পর খাবার খেলেন। খাবার পরও বহু খাবার রয়ে গেল। পরের দিন খাবার জন্য তোলা রইল সে সব।

এরপর থেকে বাবা ছেলের কারুরই আর খাবার কিনতে যেতে হত না।

যখন যে খাবার দরকার হোত যাদু আংটির সাহায্যে তাই ছেলেটা নিয়ে আসত।

এইভাবে বাবা ছেলের আনন্দেই দিন কেটে যায়। পৃথিবীর অন্যান্য কোনও খবরাখবর রাখবার তাদের দরকার হয় না। বাবা ছেলে যা পেয়েছে তাতেই খুব খুশী।

একদিন ছেলেটার মনে হল তাইতো খাবার ছাড়া অন্য কোনও জিনিষতো আংটির কাছে চাইনি। আংটি কি অসম্ভব জিনিষ দিতে পারে। সে ভাবল, আচ্ছা বাড়ির সামনের ঐ গাছটার পাতা যদি সোনার হয়ে যায়, ফলগুলো হয় হীরে আর মোতির তাহলে খুব মজার ব্যাপার হয়।

এই ভেবে ছেলেটা তার যাদু আংটি ডান হাতের মাঝের আঙ্গুলে ঘোরাতে ঘোরাতে একদমে, মনে মনে এইসব কথা বলতে লাগল। কি অবাক ব্যাপার! এই সব কথা মনে মনে বলা মাত্রই তাদের কুঁড়ে ঘরের সামনে গাছটার পাতাগুলো সোনার হয়ে গেল আর গাছের ফলগুলো হয়ে গেল হীরে আর মোতির। গাছটার চারপাশও অদ্ভুত সুন্দর হয়ে গেল।

এরপর এই অদ্ভুত সোনার গাছ আর তার হীরে-মোতি ফলের খবর ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে

এই খবর সেখানকার রাজার কানেও গিয়ে পৌঁছাল। রাজা নিজে এই সোনার গাছ আর তার হীরে-মোতির ফল দেখবার জন্য এলেন। সবাই বল্ল এইসব অবাক কাণ্ড করেছে ছেলেটা নিজে। তার নাকি অদ্ভুত যাদুশক্তি আছে।
রাজা তখন ছেলেটাকে বল্লেন—"চল আমার রাজবাড়িতে। সেখানকার বাগানে যদি তুমি এইরকম সোনা হীরে ও মোতির গাছ তৈরী করে দিতে পার, তবেই বুঝব সত্যিই তোমার যাদু শক্তি আছে। আর তাহলে, আমার একমাত্র মেয়ের সংগে তোমার বিয়ে দেব। আর যদি এটা মিথ্যে হয় তাহলে কিন্তু তোমায় শূলে চড়িয়ে মেরে ফেলব।"
রাজার এই কথা শুনে ছেলেটার বৃদ্ধ বাবা তো খুব ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু ছেলেটা বল্ল—"ভয় কি বাবা, দেখ না, রাজ-কন্যাকে বিয়ে করেই আমি ফিরে আসছি।' এই বলে ছেলেটা রাজার সংগে রাজবাড়ির দিকে চললো। তবে ছেলেটা রাজাকে বল্ল—"আমি আপনার বাগানের একটা গাছকে সোনার আর ফলগুলো হীরে-মোতির করে দেব, কিন্তু এই যাদুর সময় কেউ কাছে থাকতে পারবে না। কেউ যদি দেখে তবে আমার যাদু কাজ করবে না।" রাজা তাতেই রাজী হলেন। ছেলেটা রাজার সংগে তখন রাজবাড়িতে এসে পৌঁছল।
সেই রাজার ছিল দুই রাণী। বড় রাণীর কোনো ছেলে-মেয়ে কিছুই ছিল না। আর ছোট রাণীর ছিল একটিই সন্তান, সেই একমাত্র রাজকন্যা। রাজা এই রাজকন্যাকে খুবই ভালবাসতেন। বড় রাণী কিন্তু ছোট রাণী বা রাজকন্যা কাউকেই দেখতে পারতেন না। তাই রাজার মুখে যখন ছেলেটার সব কথা শুনলেন, তখন বড় রাণীর হিংসেয় বুক ফেটে যেতে লাগল। রাণীর ভাবনা যদি সত্যিই ছেলেটা যাদুতে হীরে-মোতির ফল তৈরী করে ফেলে, তাহলে কি করে বিয়ে বন্ধ করা যাবে?

এদিকে ছেলেটা রাজার বাগানে পৌঁছে ঘুরতে ঘুরতে সবার অজান্তে যাদু আংটি ঘোরাতে ঘোরাতে মনে মনে বল্ল—"সামনের গাছটার পাতা সোনার, ফলগুলো হীরে-মোতির হয়ে যাক।" আর সংগে সংগেই তাই-ই হয়ে গেল।

বড় রাণী কিন্তু সবসময়েই লুকিয়ে লুকিয়ে ছেলেটার দিকে নজর রাখছিলো। তাই বড় রাণী যখন দেখলেন ছেলেটা আংটিটা ঘোরাল আর তারপর সব সোনা হীরে ও মোতির হয়ে গেল, তখন বুঝতে পারলেন আংটিতেই যাদু আছে, ছেলেটার কোনও যাদুশক্তি নেই। বড় রাণী ভাবলেন, তিনি যদি আংটিটা ছেলেটার কাছ থেকে নিয়ে নিজের কাছে রাখতে পারেন, তাহলে তাঁর যা ইচ্ছে তাই-ই করতে পারবেন। তখন রাজা ছোট রাণীর চেয়ে তাকেই বেশী ভালবাসবেন।

তাই বড় রাণী রাজাকে গিয়ে বল্লেন—"ছেলেটার কী অপূর্ব ক্ষমতা! সে যদি আজ রাত্রে তাদের সংগে খায়, রাজবাড়িতে রাত কাটায়, তবে বড় রাণী খুব খুশী হবেন।"

রাজা তো বড় রাণীর মতলব জানেন না। তিনি সরল বিশ্বাসে ছেলেটাকে রাত্রে খেয়ে-থেকে যেতে বল্লেন। ছেলেটাও রাজার বিশেষ অনুরোধে রাজী হল।

সে রাত্রিতে প্রচুর ভাল ভাল খাবার ছেলেটাকে খেতে দিলেন বড় রাণী। খাওয়ার পর বড় রাণী তার পাশের ঘরে, আদর করে ছেলেটাকে শুতে দিলেন। ছেলেটা কিছুক্ষণের মধ্যে আরামে ঘুমিয়েও পড়ল।

সবাই যখন রাজবাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন বড় রাণী ধীরে ধীরে ছেলেটার ঘরে ঢুকে ছেলেটার হাত থেকে যাদু-আংটি খুলে নিয়ে নিজের ঘরে পালিয়ে এলেন। রাণী কিন্তু একথা জানতেন না যে, যাদু-আংটি ঐ ছেলেটি ছাড়া আর কারুর হাতে গেলে তার যাদু নষ্ট হয়ে যায়। ফলে রাণী আংটিটা খুলে নেওয়া

মাত্রই তার যাতুও নষ্ট হয়ে গেল। বাগানের গাছটাও যাতু-শক্তি হারিয়ে আগের মতই সাধারণ গাছ হয়ে গেল।
সকালে রাজার বাগানে রাজার সেই অদ্ভুত গাছের সোনার পাতা, হীরে-মোতির ফল দেখবার জন্য বহুলোক আসতে লাগল। কিন্তু এসে সবাই দেখল কোথায় কী, গাছ সেই আগেকার মতই আছে। তাতে না আছে সোনার পাতা, না আছে হীরে-মোতির ফল। তাই দেখে সবাই খুব হাসাহাসি করে রাজার পাগলামী সম্বন্ধে যা তা বলে চলে গেল।
এরকম খবর শুনে রাজাও ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি ভাবলেন ছেলেটা একটা মস্ত ধাপ্পাবাজ, প্রতারক। আসলে ছেলেটার যাতুশক্তি নেই। তাই রাজা এবার ছেলেটার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন। ঠিক হল পরের দিন সকালে সবার সামনে ছেলেটাকে শূলে চড়ানো হবে। এজন্য তাকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হল। ছেলেটা আর কি করে! তার হাতের যাতু-আংটিটাও হারিয়ে গেছে। এখন কারাগারের মোটা মোটা দেওয়াল, আর ভারী মজবুদ দরজা ভেঙ্গে বেরুবার কোনো উপায় নেই। ছেলেটা বুঝতে পারল মৃত্যুদণ্ডই তার কপালে রয়েছে। এই সব খবর পেয়ে রাজার বড় রাণী তো খুব খুশী।
ওদিকে দয়ালু ছেলেটার তিনটে বন্ধু ছিল। কুকুর, ইঁতুর আর বেড়াল। এদেরকে সে নির্দয় চাষীর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। তারা তিনজনে কিন্তু ছেলেটার অজান্তে তার কাছাকাছি থাকত। ছেলেটার এই বিপদ দেখে তারা গভীর শলা-পরামর্শ শুরু করল। কী করে ছেলেটাকে বাঁচানা যাবে? শেষে তারা বুঝল, যাতু আংটি ফেরত পেলে তবে ছেলেটা বাঁচতে পারে।
পরমার্শ করবার পর ইঁতুর রাজার বাগান থেকে বড় রাণীর ঘর পর্যন্ত একটা সুরঙ্গ বানিয়ে ফেল্ল। বেড়াল সেই সুরঙ্গ দিয়ে বড় রাণীর ঘর পর্যন্ত পৌঁছাল। তুজনেই রাণীর দিকে নজর

রাখতে লাগল। বড় রাণী কোথায় যাদু আংটি রেখেছেন তারা তা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে লাগল।

এদিকে যাদু আংটি পাছে কেউ নিয়ে নেয়, সেজন্য বড়রাণী সেটাকে সবসময় নিজের মাথার চুলের মধ্যে লুকিয়ে রেখে-ছিলেন। আংটিটা খুঁজে না পেয়ে, বড় রাণী ঘুমাবার পর, ইঁদুরটা বড় রাণীর বুকের ওপর উঠে নাচতে লাগল। তাতেই বড় রাণীর ঘুম ভেঙ্গে গেল, তারপর ইঁদুরকে দেখে ভয়ে ঘরের মধ্যে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। ছোটাছুটির সময় চুলের মধ্যে থেকে আংটিটা মেঝেয় পড়ে গেল। বেড়ালটাও তখন চট করে আংটিটা মুখে নিয়ে সুরঙ্গ দিয়ে বাগানে পালিয়ে এল।

ওদিকে কুকুরটাও তার পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ে জেলখানার ভেতর পর্যন্ত একটা সুরঙ্গ বানিয়ে ফেলেছে। সেই সুরঙ্গ দিয়ে যাদু আংটি নিয়ে বেড়ালটা জেলখানার ভেতর ছেলেটার কাছে পেঁছে গেল। দয়ালু ছেলেটা তার তিন বন্ধু বেড়াল ইঁদুর ও কুকুরের সাহায্যে যাদু আংটি ফিরে পেল।

পুরোনা বন্ধুদের দেখতে পেয়ে ছেলেটাতো খুব খুশী। এরপর ছেলেটা যাদু আংটি ডান হাতের মাঝের আঙ্গুলে পরে নিল। আর আংটি ঘোরাবার সংগে সংগে মনে মনে একদমে বলা মাত্রই জেলখানার দেওয়াল ফাঁক হয়ে গেল। আর ছেলেটা চোখের পলকে জেলখানার বাইরে বেরিয়ে এল।

ছেলেটার হাতে এখন যাদু আংটি। তাই ছেলেটা কাউকে আর ভয় করছে না। সে জানে রাজাও তাকে কিছু করতে পারবেন না। সে রাজার কাছে গিয়ে বল্ল—এবার রাজকন্যার সংগে তার বিয়ে দিতে হবে।

রাজাতো ছেলেকে দেখে অবাক। তারপর বল্লেন—"জেলখানা থেকে পালিয়ে এলে কি করে? শোনো, সোনার পাতা আর হীরে-মোতির ফলওয়ালা গাছ তৈরী করে দিতে পারলে তবেই

রাজকন্যা দেব বলেছিলাম। তুমি তা পার নি তাই রাজকন্যা ত পাবেই না, বরং মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হবে তোমায়।

ছেলেটা তখন রাজাকে বল্ল—"ঠিক আছে। আপনার কথাই আমি মানছি। বাগানে চলুন, দেখা যাক্ বাগানের ঐ গাছটার পাতা সোনার আর ফলগুলো হীরে-মোতির হয়েছে কিনা ! যদি হয় তো রাজকন্যাকে পাব, না হলে শূলেই যাব।"

রাজা ছেলেটাকে নিয়ে বাগানে গিয়ে দেখেন বাগানের মাঝখানে গাছে ঝক্‌মক্ করছে সোনার পাতাগুলো আর ঝিক্‌মিক্ করছে হীরে-মোতির ফলগুলো। রাজা তাই দেখে খুব খুশী হলেন। ছেলেটাও তখনরাজাকে সব কথা বল্ল। এই না শুনে রাজা বেজায় রেগে গিয়ে হিংসুক বড় রাণীকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর রাজকন্যার সংগে ছেলেটার বিয়ে হল ধূমধাম করে। বিয়ের পর ছেলেটা রাজকন্যা এবং তার তিন বন্ধু—বেড়াল, কুকুর আর ইঁদুরকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এল। এরপর যাদু আংটির সাহায্যে তাদের কুঁড়ে ঘরকে বিরাট এক প্রাসাদ বানিয়ে ফেল্ল। তারপর সবাই মিলে আনন্দে সেই প্রাসাদে দিন কাটাতে লাগল।

নিঃস্বার্থ উপকার বিফলে যায় না ছেলেটাই তা দেখিয়ে দিল।

ভালুক ও চাষীর মেয়ে

অনেকদিন আগে এক গ্রামে এক বৃদ্ধ চাষী বাস করত। চাষীর অবস্থা বেশ ভালই ছিল। চাষীর একটি মেয়ে ছিল, কিন্তু স্ত্রী ছিল না। বহুদিন আগেই মেয়েকে ছোট রেখে স্ত্রী মারা যান। চাষীই মেয়েকে মানুষ করত।

এই চাষীর সব আত্মীয়-কুটুম্বরা বহু দূর-দূর গ্রামে বাস করত। মেয়েটা ছোট থাকায় চাষী বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে পারত না, ফলে কোনও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখাও করতে পারত না। ক্রমে মেয়েটা যখন বড় হল তখন চাষী একদিন মেয়েকে বাড়িতে রেখে দূর গ্রামের আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে গেল। মেয়ে তো বড়ই হয়েছে, তাই একলা থাকতে সে একটুও ভয় পেল না।

বাড়ি থেকে তো চাষী রওনা হল তার ঘোড়ার পিঠে চেপে। দূরগ্রামের আত্মীয়ের বাড়ি যাতে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারে সেজন্য গ্রামের পাকা রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছোট রাস্তা ধরে চাষী রওনা হল। সে সময় তো আর এত রাস্তা-ঘাট তৈরী হয়নি। আর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ভালো কোন রাস্তাও হয়নি সে সময়। চাষী গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা ছোট রাস্তা ধরে ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে সন্ধ্যে হবার আগেই জঙ্গল পার হল। আর জঙ্গলের অন্যপারে তার যে আত্মীয় আছে তাদের বাড়িতে পৌঁছাল। চাষীর সেই
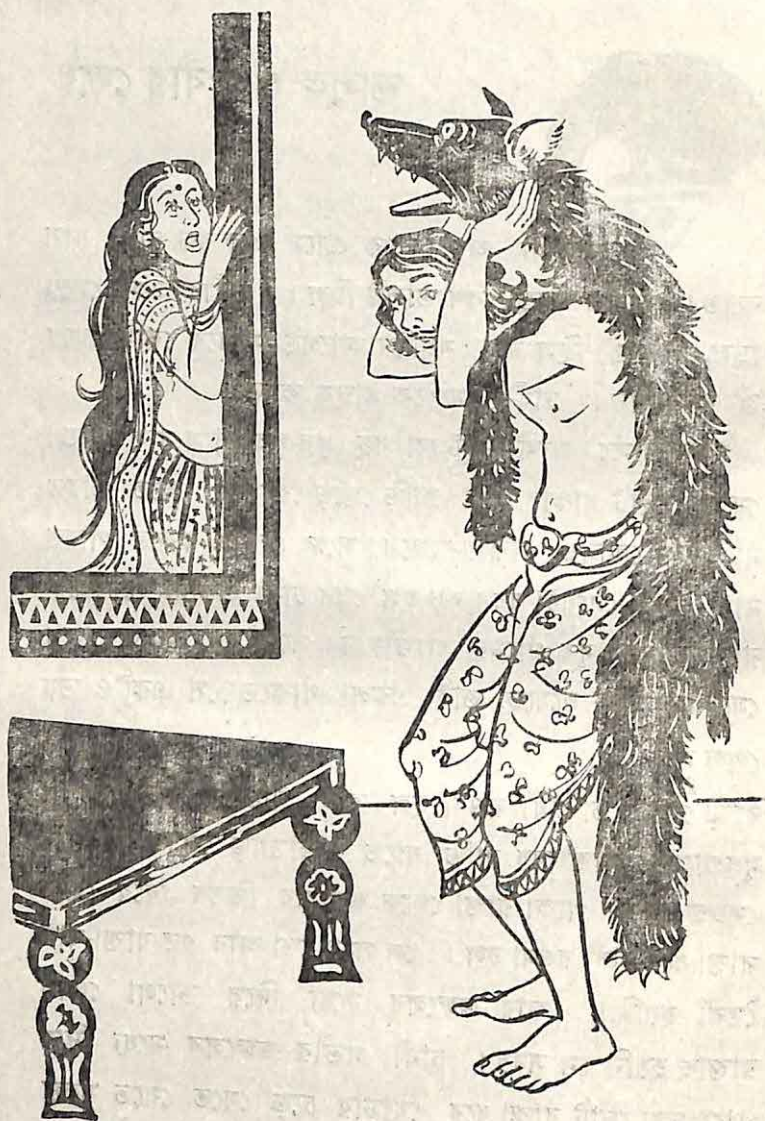
ভালুক তার গা থেকে চামড়াটা খুলে ফেলছে

আত্মীয়রা সবাই ছিল খুব ধনী আর খুবই আমুদে লোক। চাষী খুব আনন্দেই সেখানে কিছুদিন থাকল। তারপর একদিন আবার নিজের গ্রামে ফিরে আসবার জন্য রওনা হল।
আগের মতই তাড়াতাড়ি ফেরার জন্য চাষী তো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির দিকে ফিরছে। কিন্তু ফিরতি পথে গভীর জঙ্গলের মধ্যে চাষী পথ হারিয়ে ফেলল। আর জঙ্গলে পথ হারিয়ে চাষী ঘুরতে ঘুরতে আরও গভীর জঙ্গলেই চলে গেল। চাষীর কী দুর্ভাগ্য, সেই গভীর জঙ্গল থেকে বেরুবার কোনও রাস্তা সে আর দেখতেই পাচ্ছে না! এদিকে ক্রমেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায়। চাষী তাই মরিয়া হয়ে সঠিক পথ খুঁজে পাবার জন্যে সমানেই জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে থাকল। ইতিমধ্যে ক্লান্ত ঘোড়াকে নিয়ে চলতে চলতে চাষী হঠাৎ দেখতে পেল একটা আলোর রেখা সামনে থেকে আসছে। কাছে কোনও বাড়ি থাকতে পারে, এই ভেবে চাষী সেই আলোর রেখার দিকেই ক্রমে চলতে শুরু করল। ধীরে ধীরে যখন আলোর সামনে এসে পোঁছাল, তখন দেখল যে সে এক বিরাট প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চাষীতো বিরাট প্রাসাদের মধ্যে ঢুকতে ভয় পাচ্ছিল। সামান্য চাষী সে, প্রাসাদে ঢুকলে কেউ যদি কিছু বলে, এই ছিল তার ভয়। কিন্তু অন্ধকার হয়ে এসেছে। জঙ্গল থেকে বাঘের ডাকও শোনা যাচ্ছে। তাই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে ঘুরতে চাষীর আর ভরসা হল না। সে সাহস করে প্রাসাদের মধ্যেই ঢুকে পড়ল।
প্রাসাদে ঢুকে চাষী চারদিক খোঁজাখুঁজি শুরু করল। কিন্তু কোথাও কোনও লোকজন নেই। কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না সে। এই সময় আচমকা কোথা থেকে এক বিরাট ভালুক থপথপ করে চাষীর সামনে এসে দাঁড়াল।
ভালুকটা চাষীকে জিজ্ঞেস করল—"কি চাই তোমার?"

বেচারি চাষী ভালুক দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। কাঁপতে কাঁপতে সে মনে মনে ভাবল, এবার ভালুকের হাতে হয়তো তার প্রাণটাই যাবে! ভালুক তার ধারালো নখ দিয়ে নিশ্চয় তাকে চিড়ে ফেলবে। কিন্তু কি আশ্চর্য! ভালুক কিন্তু চাষীকে ছুঁলও না।

বরং ভালুকটা চাষীকে আবার জিজ্ঞাসা করল—"কি চাই তোমার? আমাকে ভয় পেও না। আমি হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারি।"

চাষী তখন বল্ল—"আমি আমার আত্মীয়দের বাড়ি থেকে আসছিলাম। জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছি। এখন রাত্রি হয়ে গেছে। অন্ধকারে পথ বার করতে পারব না, বাড়িও ফিরতে পারব না। তাই এইরাত্রে কোথায় থাকা যায় সে কথা যদি তুমি বলতে পার তো খুব উপকার হয়।"

ভালুক বল্ল—"তুমি এই প্রাসাদেই থাকতে পার। আমি ছাড়া এই প্রাসাদে আর কেউ থাকে না।"

ভালুক কোনও ক্ষতি করছে না দেখে চাষীর মন থেকে ভয় দূর হল। সে সেই রাত্রে ভালুকের সঙ্গে প্রাসাদে থেকে যেতে রাজী হল।

ভালুক চাষীর জন্য ভালো খাবার নিয়ে এল। দুজনে একসঙ্গে সেই খাবার খেল। ভালুকটা ঠিক মানুষের মতই চলাফেরা খাওয়া-দাওয়া করছে দেখে চাষী তো অবাক।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পর ভালুক চাষীকে নিয়ে গেল নিজের বিছানায়। দুজনেই এক বিছানায় শুল। ভালুককে ঠিক মানুষের মত বিছানায় শুতে দেখে চাষী আরও অবাক হয়ে গেল। এই বিশাল রাজপ্রাসাদে ভালুক একা একা থাকে, অথচ মানুষের মত চলাফেরা করে, কথা বলে, এইসব ভাবতে ভাবতে অবাক ক্লান্ত চাষী একসময়ে ঘুমিয়েও পড়ল।

সকাল বেলায় চাষীকে ভাল ভাল খাবার খেতে দিল ভালুক, চাষীর ঘোড়াকেও খেতে দিল ভাল দামী ছোলা। তারপর জিজ্ঞেস করল—"এবার কি করতে চাও?"
চাষী বল্লে—"আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই। ঘরে মেয়েটা একলা আছে, এবার না ফিরে গেলে সে চিন্তা করবে।"
ভালুক বল্ল—"বেশ, তুমি তাহলে যেতে পার।"
চাষীতো ভালুকের রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ল। ঘোড়ায় চড়ে সারাদিন ধরে জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু জঙ্গল থেকে বের হবার কোন রাস্তাই খুঁজে পেল না। ঘুরতে ঘুরতে চাষী কেবল ভালুকের প্রাসাদের সামনেই এসে পৌঁছাল। ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে এল। তবুও চাষী জঙ্গল থেকে বেরুতে পারল না। ক্লান্ত চাষী তাই বাধ্য হয়ে তার ক্লান্ত ঘোড়াসহ ভালুকের প্রাসাদেই ফিরে এল। প্রাসাদে ফিরে গিয়ে চাষী ভালুককে বল্ল—
"আমি আজকেও রাস্তা খুঁজে পাইনি। আজকের রাতটাও এখানে আমাকে থাকতে দাও।"
ভালুক খুশী হয়ে চাষীকে সে রাতেও থাকতে দিল। আগের দিনের মতই রাত্রে ভালো ভালো খাবার খেতে দিল। শোবার জন্য তার বিছানা ছেড়ে দিল। এমনকি চাষীর ঘোড়াকেও যত্ন-আত্তি করল প্রচুর।
সকাল বেলায় চাষী ভালুককে বল্ল—"এবার আমি বাড়ি ফিরব। আমার বাড়ি ফেরার রাস্তাটা আমি জঙ্গলের মধ্যে কিছুতেই বার করতে পারছি না। সেই পথটা কি তুমি দেখিয়ে দেবে?"
ভালুক বল্ল—"নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু তার বদলে তোমাকে কথা দিতে হবে যে তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে।"
ভালুকের এই প্রস্তাবে চাষী তো হতবাক। ভালুকের এই প্রস্তাব চাষীর একটুও ভাল লাগল না। ভালুককে বিয়ে করলে তার

মেয়ে হয়ত প্রাসাদে এসে থাকবে কিন্তু তাই বলে ভালুকের সঙ্গে তার মেয়ের কি করে বিয়ে হবে? এই অসম্ভব প্রস্তাবকে চাষী আমলই দিল না।

চাষী তাই জঙ্গলের মধ্যে পথ বার করবার জন্য তার ঘোড়া নিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়ল। ভালুকও চাষীকে কিছু বল্ল না, বরং চাষী রওনা হওয়ার সময় তাকে যথাযথ সম্মানই দেখাল। ঘোড়া নিয়ে সমস্ত দিন ধরে চাষী আপ্রাণ চেষ্টা করেও হারানো পথ খুঁজে বার করতে পারল না। বরং আগের দিনের মতই ঘুরতে ঘুরতে বারবার ভালুকের প্রাসাদের সামনে এসে পৌঁছাল। ওদিকে ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে এসেছে।

চাষী তখন আর কি করে? বাধ্য হয়েই ভালুককে সে রাতটাও প্রাসাদে থাকতে দিতে বল্ল। ভালুক আগের দিনের মতই চাষীকে যত্ন করে খেতে দিল, রাত্রিতে তার বিছানায় শুতে দিল। এমনকি চাষীর ঘোড়াটারও যত্ন-আত্তি করল।

সকাল হলে চাষী ভালুককে বল্ল—আমি কালকেও জঙ্গলের পথটা বার করতে পারিনি। আমাকে বাড়ি ফেরার পথটা দেখিয়ে দাও। আমি বাড়ি না ফিরলে মেয়েটা চিন্তা করবে, কান্নাকাটি করবে।"

ভালুক ঠিক আগের দিনের মতই বল্ল—"নিশ্চয় দেব। কিন্তু তার বদলে তোমায় কথা দিতে হবে যে তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে।"

চাষী একবার ভাবল সে রাজী হয়ে যাবে। কিন্তু তখনই মনে পড়ল মেয়েটা যদি ভালুককে বিয়ে না করে, তবে ভালুক তাকে মেরেই ফেলবে। তাই অনেক চিন্তা-ভাবনা করে চাষী ঠিক করল সেদিনও সে নিজেই আর একবার হারানো পথ বার করতে চেষ্টা করবে। শেষবারের মত চেষ্টা করে দেখবে।

এবারও তাই চাষী ঘোড়াকে নিয়ে নিজেই জঙ্গলে বেরিয়ে

পড়ল। ভালুকও চাষীকে কিছু বল্ল না, বরং চাষী রওনা হওয়ার সময় তাকে যথাযথ সম্মানই দেখাল।

চাষী ঘোড়া নিয়ে জঙ্গলে বেরিয়ে পড়েছে নিজে নিজেই। তবু দিন ভর ঘুরে ঘুরে কিছুতেই বাড়ি ফেরার হারানো পথটা বার করতে পারল না। তার বদলে সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যেবেলায় চাষী দেখল, সে ভালুকের প্রাসাদের সামনেই ফিরে এসেছে! চাষী এবার বুঝতে পারল ভালুকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে না দিলে এই জঙ্গলেই তাকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। তাই ভালুককে বল্ল, তার সঙ্গেই সে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী।

ভালুক চাষীকে ঠিক আগের মতই আদর করে প্রাসাদে নিয়ে গেল, ভাল ভাল খাবার খেতে দিল। তার বিছানায় শুতে দিল। চাষীর ঘোড়াটাকেও আদর-যত্ন করল। শ্বশুরকে যেমন আদর-যত্ন করা উচিত, ভালুক চাষীকে এবারে সেরকমই যত্ন করল।

সকাল হলে চাষীর সঙ্গে ভালুকও তার প্রাসাদ থেকে রওনা হল। আর তারপর হারানো রাস্তা বার করে দিয়ে জঙ্গল থেকে চাষী যাতে সহজেই বেরুতে পারে তার সব ব্যবস্থা করে দিল।

চাষীতো গভীর দুঃখ নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরল। তারপর একসময় বাড়িতে এসেও পৌঁছাল। মেয়ে বাবাকে চিন্তিত হয়ে বাড়িতে ফিরতে দেখে জিজ্ঞেস করল— "বাবা, আমাদের কোনও আত্মীয়-স্বজন কি অসুস্থ? না কোন আত্মীয় মারা গেছে? তুমি এত চিন্তিত কেন?"

চাষী ভালুকের ঘটনা মেয়েকে বলবে না ঠিক করেছিল। কিন্তু মেয়ের পীড়াপীড়িতে শেষে না বলেও থাকতে পারল না। চাষী একে একে ভালুকের সমস্ত ঘটনাই মেয়েকে বল্ল। এমনকি সে যে ভালুকের সঙ্গে তার বিয়ে দেবে বলে কথা দিয়ে এসেছে,

সে কথাও বলতে বাধ্য হল।
বাবার সব কথা শুনে মেয়ে একটুও দুঃখ পেল না। সে তার বাবাকে বল্ল—
"ভালুক তো তোমার কোনও ক্ষতি করেনি। বরং ভালভাবে তুমি যাতে বাড়ি ফিরতে পার সে ব্যাপারে সাহায্য করেছে। এই ভালুককে বিয়ে করলে আমার কোন ক্ষতিই হবে না। তুমি যখন কথা দিয়ে এসেছ, তখন ভালুককেই আমি বিয়ে করব।"
চাষী আর কি করে, মেয়েও যখন ভালুককে বিয়ে করতে রাজী, আর সেও যখন ভালুককে কথা দিয়েছে, তখন মেয়েকে সঙ্গে করে জঙ্গলে ভালুকের প্রাসাদে ফিরে এল। ভালুক তাদের দুজনকে দেখে সমাদরে প্রাসাদের মধ্যে নিয়ে গেল।
ভালুক চাষী আর তার মেয়েকে খুব দামী দামী খাবার খেতে দিল। নিজের ঘরটাও দিয়ে দিল তাদের থাকতে। এমনকি সব রকম সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখতে লাগল। কয়েকদিন থাকবার পর চাষী যখন বল্ল যে, এবার ভালুকের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়েটা হয়ে যাক, তখন ভালুক বল্ল—
"নাঃ, আমি তিনমাস অপেক্ষা করব। যদি দেখি আপনার মেয়ে সত্যিকার খুশী মনেই আমায় বিয়ে করছে তবেই বিয়ে করব। আর তা নাহলে জঙ্গলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আসব।"
এই কথা শুনে চাষী আর কি করে! চুপ করে, সব কথা শুনে একা একাই নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেল। আর মেয়েটা ভালুকের প্রাসাদেই থেকে গেল।
ভালুক আর চাষী-মেয়ে দুজনেই জঙ্গলের মধ্যে প্রাসাদে দিন কাটায়। ভালুক চাষী-মেয়ের সঙ্গে সবসময় ভাল ব্যবহার করে, সবরকম যত্ন-আত্তি করে। ধীরে ধীরে চাষী-মেয়েরও ভালুকের ওপর ভয় কেটে গেল। চাষী-মেয়েরও ক্রমে ভালুককে ভাল

লাগতে থাকল।

চাষী-মেয়ে কিন্তু সবসময়েই একথা ভাবে ভালুক কি করে মানুষের মত কথা বলে, মানুষের মত চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া করে। ভালুক চাষী-মেয়ের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া গল্প-গুজব করে। কিন্তু চাষী-মেয়ে লক্ষ্য করতে লাগল যে ভালুক সমস্তদিন তার সঙ্গে থাকলেও রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পর যখন আলাদা ঘরে শুতে যায়, তখন সেই ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে শোয়, যাতে সেই সময় কেউ তাকে দেখতে না পারে। চাষী-মেয়ের এইসব দেখে ভালুক সম্বন্ধে কৌতূহল ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে।

একদিন রাত্রে চাষী-মেয়ে করেছে কি, ভালুক যখন খেতে বসেছে, তখন এক ফাঁকে উঠে এসে ভালুকের ঘরের একটা দরজার ছিটকিনি ভিতর থেকে খুলে রেখে দিয়ে এসেছে। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর ভালুক যখন তার শোবার ঘরের অন্য দরজাটা বন্ধ করে শুতে গেছে, তখন চাষী-মেয়ে আস্তে-আস্তে ভালুকের শোবার ঘরের কাছে গিয়ে দরজার তালার ফাঁক দিয়ে দেখতে চেষ্টা করে, ভালুক এরপর কি করে। একটু পরেই চাষী-মেয়ে দেখতে পেল, ভালুক তার গা থেকে চামড়াটা খুলে ফেলছে, যেন গায়ের জামা খুলছে এমনিভাবে। আর তার পর মানুষের শরীর বেরিয়ে পড়ল, মুখটা শুধু ভালুকের মুখই থেকে গেল। চাষী-মেয়ে তখন বুঝলে পারল যে, এই ভালুক সত্যিকারের ভালুক না, নিশ্চয়ই সে মানুষ। হয়তো কোনও যাদু-মন্ত্রে তার এই অবস্থা হয়েছে। দয়ালু ভালুকটার এই অবস্থা দেখে চাষী-মেয়ের খুব দুঃখ হল।

চাষী-মেয়ে এরপর সমানেই চিন্তা করতে থাকল কি করে ভালুকের কিছু উপকার করা যায়। একদিন রাত্রে যখন ভালুক ঘরে গিয়ে শুতে যাওয়ার পর তার ভালুকের চামড়া খুলে

বিছানায় ঘুমিয়ে আছে তখন চাষী-মেয়ে আস্তে আস্তে ভালুকের ঘরে ঢুকে পড়ল। তারপর ভালুকের চামড়াটা নিয়ে পালিয়ে এল। ভালুক তো তখন ঘুমিয়ে। তাই সে এসব কিছুই টের পেল না।

এদিকে চাষী-মেয়ে চামড়াটা নিয়ে গিয়ে প্রাসাদের কোণে রান্নাঘরে গিয়ে সেটাকে পুড়িয়ে ফেলল। কিন্তু চামড়াটা পুড়িয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই ভালুকটা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। চাষী-মেয়ে বুঝতে পারল যে, সে ভালুকের চামড়াটা পুড়িয়ে ফেলার জন্যই এসব হয়েছে। কিন্তু তখন তার আর কিছু করার ছিল না। ভালুক অজ্ঞান অবস্থায় পরের দিনটাও থাকল। তার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। তৃতীয় দিনে ভালুকের অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল। ভালুকের বিছানার পাশে বসে চাষী-মেয়ে তখন অঝোরে কাঁদতে শুরু করেছে।

এদিকে ভালুকের অবস্থা ক্রমেই খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। চতুর্থ দিনে মনে হল ভালুকের জীবন বোধ হয় শেষই হবে। তখন চাষী-মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্ল—

"ভালুকের কিছু হলে সেও আত্মহত্যা করবে। তারজন্যই ভালুকের এইসব হল। এখন সে সত্যিই ভালুককে ভালবেসে বিয়ে করতে চায়। তাই ভালুক না বাঁচলে সেও বাঁচবে না।" —এই বলে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে চাষী মেয়ে কখন যেন ভালুকের বিছানার পাশেই ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে।

পঞ্চম দিনের সকালে চাষী-মেয়ে ঘুম ভেঙ্গে দেখে সামনে এক অপূর্ব সুন্দর রাজপুত্র দাঁড়িয়ে আছে। লোকজন, দাস-দাসীতে প্রাসাদ ভরে গেছে। চারদিকে আনন্দের বন্যা। রাজপুত্রের দিকে তাকিয়ে চাষী-মেয়ের যেন আর চোখের পলক পড়ে না। রাজপুত্রও মুগ্ধ চোখে চাষী-মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

চাষী-মেয়ের এখন আর বুঝতে অসুবিধে হয় না, যে তার সামনে দাঁড়ানো এই সুন্দর রাজপুত্রই ছিল ভালুকের চেহারা নিয়ে। ভালুকের রাজপুত্র রূপ দেখে চাষী-মেয়ের আর আনন্দ ধরে না। এবার সে রাজপুত্রের পায়ের কাছে নুয়ে পড়ে বল্ল—
"তোমার ভালুক-চামড়া পুড়িয়ে ফেলাতে তোমার যে ভীষণ অসুখ করেছিল তারজন্য আমিই দায়ী। রাজকুমার, তুমি আমায় ক্ষমা কর।"
রাজপুত্র রাগ না করে মিষ্টি করে হেসে চাষী-মেয়েকে বল্ল—
"তুমি জান না, ঐ কাজ করে তুমি আমাদের কত যে উপকার করেছ—তুমি তা কল্পনাও করতে পারবে না। এক মায়াদানব একদিন এই রাজ্য আক্রমণ করে আমার লোকজন, আমাদের সবাইকে নিয়েই যাদু করে। সেই যাদুতে আমি ভালুক হয়ে যাই, আর আমার লোকজনরা গাছ হয়ে বাগানে থেকে যায়। আমার রাজ্য জঙ্গলে ভর্ত্তি হয়ে যায়। সেই মায়াদানবই বলেছিল কোনও মেয়ে যদি স্বেচ্ছায়, খুশী মনে আমায় বিয়ে করতে চায়, আর আমার সেই ভালুকছালটা আমার অজান্তে পুড়িয়ে ফেলতে পারে, তবেই মায়াদানবের যাদু থেকে আমি ও আমার লোকজনরা মুক্তি পাব। এখন তুমিই সেই অভিশাপ থেকে আমাদের উদ্ধার করেছ। আজ তুমিই হবে আমার রাণী।"
এরপর চাষী-মেয়ের সঙ্গে রাজপুত্রের খুব ধূমধাম করে বিয়ে হল। চাষী-মেয়ের সব আত্মীয়-স্বজনরা বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে এল। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া, হৈ-হুল্লোড় হল। সেই বিয়েতে সবাই রাজপুত্রকে দ্যাখে, তার বিশাল ঐশ্বর্য দ্যাখে, আর চাষী-মেয়ের সৌভাগ্যের কথা বলে।
এদিকে চাষীও তো তার মেয়ের বিয়েতে উপস্থিত হয়েছে। বিয়েতে আসার সময় চাষীর মনে দুঃখের শেষ ছিল না। সে তো জানত ভালুকের সঙ্গেই তার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। কিন্তু ভালুকের

প্রাসাদের সামনে এসে দ্যাখে, কোথায় সেই গভীর জঙ্গল। সে যে বিরাট রাজপ্রাসাদ! লোক-লস্কর, পাইক-বরকন্দাজে প্রাসাদ ভর্ত্তি। তারপর রাজপুত্রকে দেখে সে তো আরও অবাক। চাষীও তার মেয়ের সৌভাগ্যের জন্য মেয়েকে বারবার আশীর্বাদ জানাল।

চাষীর আর কোনও ছেলেমেয়ে ছিল না বলে জামাই রাজপুত্র চাষীকে আর গ্রামে ফিরে যেতে দিল না। চাষী সেই প্রাসাদে মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গেই থেকে গেল। আজও সেই রাজপুত্র আর চাষী-মেয়ে মনের সুখেই রাজপ্রাসাদে বসবাস করছে। কোনও অতিথি সেখানে গেলে তারা তাদের খুব আদর-যত্ন করে। তোমরা কেউ যদি জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সেই প্রাসাদটা দেখতে পেয়ে ভয় পেও না কিন্তু। তোমরা প্রাসাদে গিয়ে চাষী-মেয়ে আর রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা করলে দেখবে তারা তোমাদেরও কত আদর যত্ন করবে। তবে আগে সেই জঙ্গলটা খুঁজে বার কর, তবে তো!

জাতিধর্ম নির্বিশেষ ভালবাসলে আপাতদৃষ্টিতে যাকে পশুর মত দেখতে মনে হয়, ঘটনাচক্রে সেও প্রকৃত রাজপুত্র হয়ে যায়।

নাবিকের যাদুদড়ি

এক সুখী দম্পতীর একই ছেলে ছিল। খুব ছোটবেলা থেকেই ছেলেটার জলের দিকে যাওয়ার একটা ঝোঁক ছিল। বাড়ি থেকে কোনও রকমে বেরুতে পারলে ছেলেটা হয় ছুটত পুকুরের দিকে কিংবা জলের কাছে। জলের কাছে যাওয়া এক প্রচণ্ড নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ছেলেটার। ছোটবেলায় তার বাবা-মা এর জন্য তাকে বহু বকাবকি করেছে, বহু মারধোর করেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। পুকুর বা নদীর জল সব সময়েই সেই ছেলেটাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকত। ছেলেটাও হাতের কাছে যা জিনিষ পেত, জল দেখলেই তা ছুঁড়ে দিত, ভাবত যেন জলে তার নৌকা চলছে। এর ফলে প্রায়ই দেখা যেত, তার মা কখনো রান্নার হাতা চামচ হারাচ্ছে, কিংবা বাবা তার টুপি-ছড়ি হারাচ্ছে। এ সবই ঘটত ঐ ছোট ছেলেটার জন্য। আর ছেলেটা ঐসব জিনিষ জলে ফেলে দিয়ে দেখত ওগুলো নৌকা হয়ে, জাহাজ হয়ে জলে ভাসছে কিনা। ছেলেটা আরও একটু বড় হলে পর গামলা নিয়ে পুকুরে চলে যেত। তখন নৌকা করে জলে ভাসাত গামলাকে। জলের নেশা ছেলেটাকে বলতে গেলে পাগল করেই রাখত।

এসব দেখে শুনে অন্য কোনও উপায় বার করতে না পেরে ছেলেটার বাবা-মা ঠিক করল ওকে নাবিকই হতে দেবে। তখন তারা এক বৃদ্ধ অভিজ্ঞ নাবিকের কাছে ছেলেটাকে নিয়ে
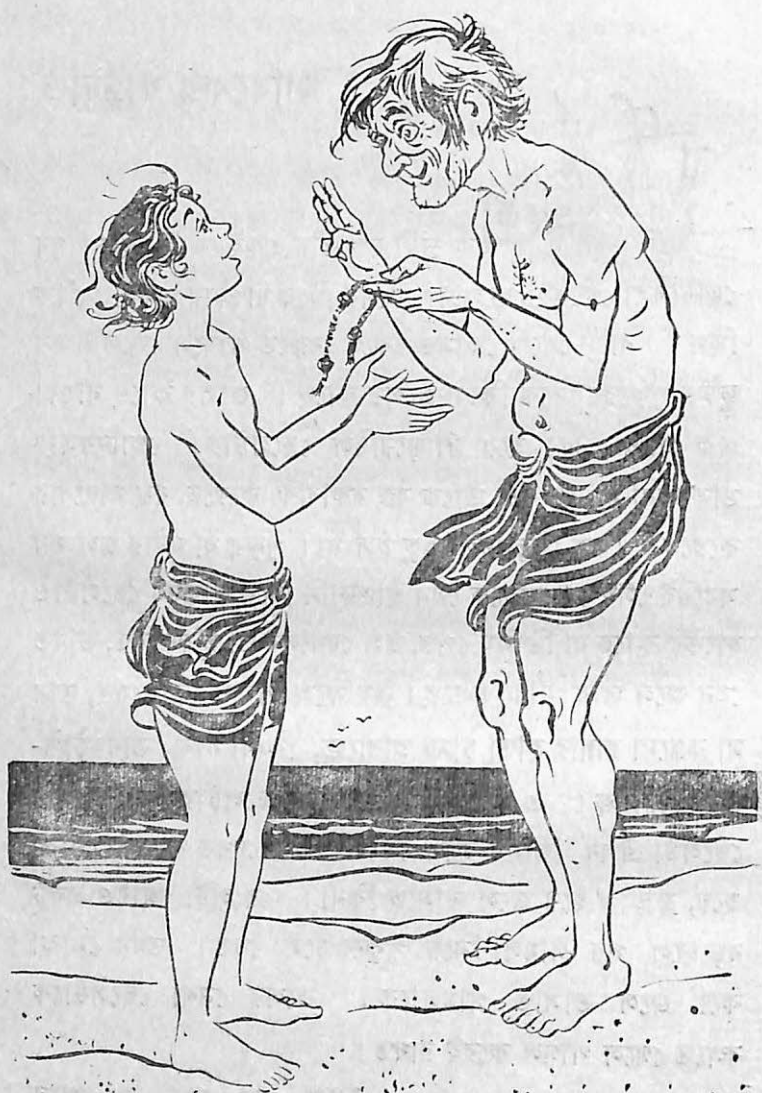
তিনটে গিঁট-ওয়ালা যাদু দড়িটা তোমায় দিলাম

গেল, যাতে ছেলেটি নৌ-চালনার নানান কৌশল তার কাছ থেকে শিখতে পারে। বৃদ্ধ নাবিক ছেলেটাকে দেখে, তার বৃত্তান্ত জেনে, নৌ-চালনা তাকে শেখাতে রাজী হল।

বেশ কয়েক বছর কেটে গেল দেখতে দেখতে। একদিন ঐ বৃদ্ধ নাবিক ছেলেটাকে তার বাবা মার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এল। ছেলেটা তখন সুন্দর সুপুরুষ যুবায় পরিণত হয়েছে।

বৃদ্ধ নাবিক ছেলেটাকে তার বাবা-মার কাছে নিয়ে গিয়ে বল্ল—"আমি যা জানি তোমার ছেলেকে সে সব শিখিয়ে দিয়েছি। তোমার ছেলের নৌ-চালনার ওপর ভীষণ উৎসাহ আছে, বুদ্ধিও আছে প্রচুর। তাই আমার বিশ্বাস তোমার ছেলে একদিন খুব নামকরা নাবিক হবে।"

তারপর বৃদ্ধ নাবিক ছেলেটাকে একটা যাদুদড়ি দিল। দড়িটায় ছিল তিনটে গিঁট। বৃদ্ধ নাবিক তখন ছেলেটাকে বল্ল—"দেখ, সাগরের চেহারা রকমফেরে কেমন হয় তা তোমায় শিখিয়েছি। বাতাসের হেরফের হলে নৌকার কি অবস্থা হয় তাও তোমাকে বুঝিয়েছি। এ সবকিছুই এখন তোমার জানা। কিন্তু বাতাস, সমুদ্র, এদের আয়ত্তে আনা, তাদের শাসন করাটাই বিরাট কাজ। যখন বাতাস থাকবে না, সাগর স্থির হয়ে থাকবে, তখন ধৈর্য ধরা শিখতে হবে। এছাড়া মনে রেখ, যখন সমুদ্রে ঝড় আসবে বা ভীষণ জোরে বাতাস বইবে তখন মনে সাহস চাই, ভয় পেলে চলবে না। তুমি সত্যিই বুদ্ধিমান সাহসী ছেলে। তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। সেজন্যই এই তিনটে গিঁট-ওয়ালা যাদু দড়িটা তোমায় দিলাম যাতে এটার যথার্থ কাজ হয়। এই যাদুদড়ি তোমার কাছে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ যে কোনও সময়ে যে কোনও সমুদ্রে নির্ভয়ে নৌকা নিয়ে যাতায়াত করতে পারবে। যদি সমুদ্রে বাতাস স্থির থাকে তবে দড়িটার একটা গিঁট খুলে দিও—দেখবে সঙ্গে সঙ্গেই সুন্দর

বাতাস চলাচল শুরু হবে। তোমাকে যদি জলদস্যু আক্রমণ করে তখন দড়ির ছুটো গিঁট খুলে দিও, তাহলে দেখবে সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় ঝঞ্ঝা শুরু হয়েছে। দেখবে ঝড়ের দাপটে জলদস্যুরা তোমাকে আক্রমণ না করে কোথায় পালিয়ে গেছে। কিন্তু সেই ঝড়েও তোমার নৌকার কোন ক্ষতি হবে না। আর তার কারণ ঐ যাছদড়িটি সঙ্গে থাকা। আবার যখন দেখবে সমুদ্র খুব উত্তাল, তখন যাছ দড়ির তিনটে গিঁট খুলে দিও। সমুদ্রও নিমেষেই শান্ত হয়ে যাবে। নৌকা চলাচলও সম্ভব হবে।"

যাছ-দড়ি পাওয়ার পর ছেলেটার খুব আনন্দ হল। ছেলেটার আর কোন কিছুতেই ভয় থাকল না। তাই সে একদিন বাবা-মার অনুমতি নিয়ে অজানা দেশের উদ্দেশে নৌকা নিয়ে রওনা হল। যাছ-দড়ির সাহায্যে সে সবসময়েই সুন্দর হাওয়া, সহজ সমুদ্রের ঢেউ পেত। ফলে তার নৌকা চলাচল সহজ হত। ধীরে ধীরে এ কথা অন্যান্য নাবিকদের কানে পৌঁছাল যে, সমুদ্র ও বাতাস ঐ ছেলেটাকে অকৃপণভাবে সাহায্য করে। একারণে ছেলেটাকে সবাই ভাগ্যবান নাবিক বলেই ডাকতে শুরু করল।

একদিন ভাগ্যবান নাবিক নানান দেশ ঘুরতে ঘুরতে সিন্ধুদ্বীপ রাজ্যে এসে পৌঁছাল। বহু নৌকা তখন সেখানকার বন্দরে নোঙর করা ছিল। সে সময় নদীতে নৌকাগুলো রওনা হওয়ার জন্য পাল তুলে প্রস্তুতও ছিল। কিন্তু হাওয়া হঠাৎ স্থির হওয়ায় নৌকাগুলো রওনা হতে পারছিল না। এমনি কাণ্ড যে একটা গাছের পাতাও নড়ছিল না। এমম কি একটা ঘাসও হাওয়ায় ছুলছিল না। সমুদ্রে ঢেউ-এর কোন চিহ্নই ছিল না।

একদিন, ছুদিন করে এইভাবেই কয়েকটা দিন পার হয়ে গেল। তবুও নৌকা চলাচলের মত হাওয়া দেখা দিল না। নৌকার নাবিকরা নানারকম তুক্‌তাক্ করল যদি হাওয়া দেয়। কিন্তু

তাতেও কোন ফল হল না। শেষে নিরুপায় হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা সুরু করল। যদি ভগবান সদয় হন। কিন্তু এসব কোন কিছুতেই কিছু হল না। ফলে সিন্ধুদ্বীপের বন্দর থেকে একটা নৌকাও রওনা হতে পারল না। বন্দরের অবস্থা হল অচল। তার চেয়েও কিন্তু নিরাশ অবস্থা হল সে দেশের রাজকুমারের। কেননা সিন্ধুদ্বীপের রাজকুমারের বিয়ে স্থির হয়ে আছে লাক্ষাদ্বীপের রাজকুমারীর সঙ্গে। কিন্তু রাজার পক্ষীরাজ নৌকা হাওয়া আর সমুদ্রের এই অবস্থার জন্য সিন্ধুদ্বীপ থেকে রওনা হতে পারছে না। রাজকুমার লাক্ষাদ্বীপেও যেতে পারছে না। এদিকে ক্রমেই দিন পার হয়ে যাচ্ছে, রাজকুমারের বিয়ের দিনও কাছে এসে যাচ্ছে। রাজকুমারও ক্রমেই বিষম চিন্তিত হয়ে পড়ছে। সিন্ধুদ্বীপের রাজকুমার জানে, বিয়ের দিনের মধ্যেই যদি সে সেখানে পৌঁছাতে না পারে, তবে লাক্ষাদ্বীপের রাজকন্যার বিয়ে অন্যদেশের রাজপুত্রের সঙ্গে হয়ে যাবে।

লাক্ষাদ্বীপের রাজকন্যা দেখতে ফুটন্ত গোলাপের মত। তাছাড়া লাক্ষাদ্বীপের রাজার আর কোন ছেলেমেয়েও নেই। তাই দেশ বিদেশের রাজকুমাররা লাক্ষাদ্বীপের রাজকন্যাকে বিয়ে করবার জন্য উৎসুক। বিয়ে হলে রাজকন্যা আর রাজ্য দুই-ই পাবে, এতো আর কম কথা নয়!

তাই সিন্ধুদ্বীপের রাজপুত্রের ভাবনার আর অন্ত নেই। ঠিক দিনের মধ্যে রাজপুত্র লাক্ষাদ্বীপে পৌঁছাতে না পারলে রাজকন্যা আর রাজ্য দুই-ই হারাবে। কিন্তু রাজপুত্র এই চিন্তা করলে কি হবে, সমুদ্রে নৌকা চলাচলের মত সহজ হাওয়াও উঠছে না, রাজপুত্রের পক্ষীরাজ নৌকাও বন্দর থেকে ছাড়তে পারছে না। বিয়ের দিন যে ক্রমেই এগিয়ে আসছে। হাতে সময় আছে আর মাত্র ছয় দিন। ছয় দিনের দিন নিশ্চয়ই লাক্ষাদ্বীপের রাজকন্যার বিয়ে হয়ে যাবে।

এই অসহায় অবস্থায় রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা করল, যে তাকে রাজকন্যার দেশে সেদিন নিয়ে যাবে তাকে একথলি মোহর দেবে। কিন্তু কোন নাবিকই এই প্রস্তাবে রাজী হল না। কেননা বাতাস সেদিনও স্থির। তাই সব নাবিকই জানে নৌকা একচুলও চলবে না, তাই সবাইকে চুপ করেই থাকতে হল। একই ভাবে সেদিনটাও পার হয়ে গেল। ফলে বিয়ের আর পাঁচদিন বাকি থাকল।

দ্বিতীয় দিন সকালে রাজকুমার বল্ল, যে তাকে লাক্ষাদ্বীপে সেদিন নিয়ে যাবে তাকে সে আজীবনের বন্ধু বলে মেনে নেবে আর প্রচুর ধনদৌলত দেবে। কিন্তু সেদিনও কোন নাবিক রাজকুমারকে নিয়ে যেতে রাজী হল না। সেদিনও সমুদ্রে বাতাস বইছে না। তাই সব নাবিকই জানে সেদিনও নৌকা একচুলও চলবে না, তাই বাধ্য হয়ে সব নাবিককেই চুপ করে থাকতে হোল। এই অবস্থায় সেদিনটাও পার হয়ে গেল। এবারে বিয়ের আর চারদিন বাকি থাকল।

তৃতীয় দিনে রাজকুমার বল্ল—"আমি এই রাজ্যই তাকে দিয়ে দেব, যে আমাকে লাক্ষাদ্বীপে আজ নিয়ে যাবে।" আগের দিনের মত সেদিনও কোন নাবিক রাজকুমারকে নিয়ে যেতে রাজী হল না। সেদিনও যে বাতাস স্থির, নৌকা চলবে কি করে সমুদ্রে? সব নাবিকরাই তাই চুপ করে থাকল। নিরাশ অবস্থায় সেদিনটাও কেটে গেল। বিয়ের আর তিনদিন বাকি থাকল।

চতুর্থদিনে রাজপুত্র হতাশ হয়ে শোকে দুঃখে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল। রাজপোষাকও আর পরতে ভাল লাগছে না। সিন্ধুদ্বীপের রাজপুত্র ধরেই নিয়েছে লাক্ষাদ্বীপের রাজকন্যার সঙ্গে তার আর বিয়ে হবে না, কারণ হাতে আছে মাত্র আর দুদিন। কি করবে রাজপুত্র, কোনও নাবিকই যে রওনা হতে চাইছে

না। সমুদ্রে বাতাস নেই, তারাই বা কি করে। ফলে ভীষণ দুঃখে হতাশায় রাজপুত্র ভেঙ্গে পড়ল।
রাজকুমারের এই দুঃখ দেখে ভাগ্যবান নাবিকেরও খুব কষ্ট হল। তার মনে পড়ল যে তার গুরু-নাবিক বলেছিল অহেতুক লোভের জন্য যাদুদড়ি ব্যবহার করলে তার ক্ষমতা চলে যাবে। তবে কেউ যদি সত্যিকার বিপদে পড়ে, তবে যাদুদড়ির সাহায্যে তাকে সহায়তা কোরো। তাই ভাগ্যবান নাবিক ভাবল রাজপুত্র এবার সত্যিকারের বিপদে পড়েছে। এবার তাকে সাহায্য করা দরকার।
ভাগ্যবান নাবিক তখন রাজকুমারকে বল্ল যে সে তাকে নিয়ে লাক্ষাদ্বীপে যাবে। আর বিয়ের সময়ের আগেই পৌঁছে দেবে রাজকুমারকে লাক্ষাদ্বীপে। তবে সেইদিন দুপুর হয়ে গেছে; তাই পরের দিন খুব ভোরে, অন্য নাবিকরা ঘুম থেকে উঠবার আগে তারা রওনা হবে। রাজপুত্র এই প্রস্তাবে খুবই খুশী হোল। পঞ্চমদিন খুব ভোরে, কোন নাবিক ঘুম থেকে উঠবার আগে, রাজকুমারকে নিয়ে ভাগ্যবান নাবিক সিন্ধুদ্বীপ থেকে রওনা হবার জন্য তার নৌকায় উঠল। তারপর রাজপুত্রকে নৌকায় বসিয়ে তার যাদু দড়ির প্রথম গিঁটটা দিল খুলে। আর সংগে সংগেই বাতাস বইতে সুরু করল, সমুদ্র চঞ্চল হোল। নৌকাও তীর ছেড়ে দ্রুত চলতে সুরু করল লাক্ষাদ্বীপের দিকে। রাজপুত্রের হাতে মাত্র সেইদিনটাই আছে। পরের দিন সকালেই লাক্ষা-দ্বীপের রাজকন্যার বিয়ে হবে। রাজপুত্র তাই খুবই চঞ্চল, কিন্তু ভাগ্যবান নাবিক কোনও ভাবনা করছে না। সে জানে যাদুদড়ি ঠিক সময়েই তাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে।
এদিকে বিয়ের আগের দিনেও সিন্ধুদ্বীপের রাজপুত্র না আসায় লাক্ষাদ্বীপের রাজা ঘোষণা করে দিয়েছেন সিন্ধুদ্বীপের রাজপুত্র যদি বিয়ের দিন সকালের মধ্যে না এসে পেঁাছায় তবে

জম্বূদ্বীপের রাজপুত্রের সংগে রাজকন্যার বিয়ে দিয়ে দেবেন। রাজকন্যা কিন্তু জম্বূদ্বীপের রাজপুত্রকে একটুও পছন্দ করত না। রাজকন্যা ভালবাসত সিন্ধুদ্বীপের রাজপুত্রকেই। কিন্তু কি আর করবে রাজকন্যা, সিন্ধুদ্বীপের রাজপুত্র না এসে পৌঁছালে রাজার কথা তাকে মানতেই হবে।

এদিকে রাজপুত্রকে নিয়ে, যাদুদড়ির সাহায্যে ভাগ্যবান নাবিক বিয়ের দিন ভোরবেলায় এসে পৌঁছাল লাক্ষাদ্বীপে। রাজার কাছে খবর পৌঁছল সিন্ধুদ্বীপের রাজপুত্রের কথা। খবর পৌঁছাল রাজকন্যার কাছেও। সবার মুখে এবার সত্যিকারের হাসি ফুটে উঠল। তারপর যথাসময়ে, খুব ধূমধাম করে সিন্ধু-দ্বীপের রাজপুত্রের সংগে লাক্ষাদ্বীপের রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল। সমস্ত লাক্ষাদ্বীপ খুশীতে ঝলমল করে উঠল।

এই বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর লাক্ষদ্বীপের বৃদ্ধ রাজা সিন্ধু-দ্বীপের রাজপুত্রকে আর দেশে ফিরতে দিলেন না। তাকেই সিংহাসনে বসিয়ে নিজে বিশ্রামের জন্য অবসর নিলেন। তাই বাধ্য হয়ে রাজপুত্রকে লাক্ষাদ্বীপেই থেকে যেতে হোল।

এদিকে ভাগ্যবান নাবিক রাজপুত্রের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সিন্ধুদ্বীপে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরী হোল। রাজপুত্রের কানে এখবরটা গেল। রাজপুত্র এসে ভাগ্যবান নাবিককে বল্ল—

"বন্ধু, এবার বল কি চাও তুমি আমার কাছ থেকে? তোমার সাহায্য ছাড়া আমার রাজকন্যাকে বিয়ে করা সম্ভব হোত না। আর তোমার জন্যই এ রাজ্যের রাজা হয়ে বসতে পেরেছি। দেখ বন্ধু, আমি তো এ রাজ্যেই থেকে গেলাম। তুমি বরং আমাদের সিন্ধুদ্বীপের রাজা হবে আমার বাবা অবসর গ্রহণ করার পর।"—এই বলে রাজপুত্র তার বাবা—সিন্ধুদ্বীপের রাজাকে—সবকিছু জানিয়ে একটা চিঠি লিখে দিল। সেই চিঠি নিয়ে ভাগ্যবান নাবিক ফিরে এল সিন্ধুদ্বীপে।

সিন্ধুদ্বীপের বৃদ্ধ রাজা তো রাজপুত্রের খবরের জন্য খুব চিন্তিত ছিলেন। ভাগ্যবান নাবিকের কাছ থেকে রাজপুত্রের সমস্ত খবর জেনে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। বৃদ্ধ রাজাও ভাগ্যবান নাবিককে বারবার ধন্যবাদ জানালেন। বল্লেন—"ভাগ্যবান নাবিকের জন্যই রাজপুত্রের বিয়ে সম্ভব হোল।" রাজপুত্রের চিঠিটাও বৃদ্ধ রাজা পড়লেন। কিন্তু তিনি সেইমূহূর্ত্তে আর অন্য কিছু ভাগ্যবান নাবিককে বল্লেন না।

সিন্ধুদ্বীপের রাজার এক সুন্দরী কন্যা ছিল। এই রাজকন্যাকে বিয়ে করবার জন্য বহু দেশের রাজপুত্র প্রস্তাব পাঠাত। রাজকন্যা কিন্তু কাউকেই পছন্দ করত না। রাজকন্যা যে শুধু রাজপুত্রকেই বিয়ে করবে তা নয়। সে চায় সুন্দর দেখতে ছেলে যার বুদ্ধি আছে, সাহস আছে, অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, যার জন্য সবদেশের লোকই সেই ছেলেকে চিনবে, শ্রদ্ধা করবে। যে সব রাজপুত্ররা সিন্ধুদ্বীপের রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চাইল তাদের না ছিল বিশেষ সাহস, না ছিল বিশেষ ক্ষমতা, তাই রাজকন্যাও তাদের বিয়ে করতে রাজী হোল না।

রাজকন্যাও শুনতে পেল ভাগ্যবান নাবিক লাক্ষাদ্বীপ থেকে ফিরে এসেছে। রাজকন্যা ভাগ্যবান নাবিককে ডেকে পাঠাল। তারপর জানতে চাইলে কি করে নাবিক রাজপুত্রকে নিয়ে যেতে পারল স্থির সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে। তারপর লাক্ষাদ্বীপে কি কি ঘটল সব বলবার জন্য অনুরোধ করল। ভাগ্যবান নাবিক সবিস্তারে সবই বল্ল। এমন কি তার যাদুদড়ির সাহায্যেই যে সে এসব করতে পেরেছে তা বলতেও দ্বিধা করল না।

সব কথা শুনে, ভাগ্যবান নাবিকের দীর্ঘ সুন্দর চেহারা দেখে রাজকন্যা এবার স্থির করল ভাগ্যবান নাবিকের যখন অদ্ভূত শক্তি আছে তখন তাকেই সে বিয়ে করবে। রাজকন্যা গিয়ে একথা জানাল সিন্ধুদ্বীপের রাজাকে। রাজারও কিন্তু ভাগ্যবান

নাবিককে ভাল লেগেছিল। তার ছেলে রাজপুত্রও যে ভাগ্যবান নাবিককে ভালবাসে তিনি তাও জানতেন। তাই ভাগ্যবান নাবিকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে তার কোন আপত্তিই হল না।

এদিকে সিন্ধুদ্বীপের রাজকন্যাকে বিয়ে করবে স্থির করে সিন্ধুদ্বীপে এসে উপস্থিত হয়েছিল সাগরদ্বীপের রাজপুত্র। সাগরদ্বীপের রাজপুত্রের কিন্তু আসল মতলব ছিল রাজকন্যাকে বিয়ে করে সিন্ধুদ্বীপের রাজা হওয়া। সাগরদ্বীপের রাজপুত্র জানত যে সিন্ধুদ্বীপের রাজপুত্র খুবই ভালমানুষ, তাই তাকে সরিয়ে সে সহজেই রাজা হতে পারবে রাজকন্যাকে বিয়ে করে। কিন্তু সাগরদ্বীপের রাজপুত্র এসে যখন শুনল যে ঐ রাজকন্যা নাবিককে বিয়ে করবে স্থির করেছে আর রাজাও তাতে মত দিয়েছেন তখন তার খুব রাগ হল। সাগরদ্বীপের রাজপুত্র সে সময় আর কিছু বল্ল না। সে শুধু রাজার কাছে অনুমতি চাইল সে রাত্রে সাগরদ্বীপে যেন তাদের থাকতে দেওয়া হয়। পরের দিনই সে সাগরদ্বীপ থেকে চলে যাবে। আর যাওয়ার আগে একবার যাতে রাজকন্যাকে দেখে যেতে পারে তারও অনুমতি চাইল। রাজা আর রাজকন্যা এতে অনুমতিও দিলেন। সাগর দ্বীপের রাজপুত্র যে খারাপ মতলবেই সেখানে সেরাত্রে থেকে গেল একথা ভালমানুষ রাজা বুঝতে পারলেন না।

এদিকে যখন রাত গভীর হয়ে গেল তখন সাগরদ্বীপের সেই মতলব-বাজ রাজপুত্র তার সঙ্গীর সাহায্যে রাজকন্যাকে প্রাসাদ থেকে চুরি করে নিয়ে গেল তার নৌকায়। তারপর রাতের অন্ধকারেই নৌকা নিয়ে সাগরদ্বীপের দিকে রওনা হয়ে গেল। সকালবেলায় রাজপুরীতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। রাজকন্যাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রমেই এই খবর রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই জানতে পারল সিন্ধুদ্বীপের রাজপ্রাসাদ থেকে রাজকন্যা

চুরি গেছে। এ খবর ভাগ্যবান নাবিকের কানেও এসে পৌঁছাল। রাজা তো রাজকন্যার জন্য শোকে ভেঙ্গে পড়লেন। প্রজারা রাজকন্যার জন্য খুউব চিন্তিত হল। কে কি করবে ভেবেই উঠতে পারছে না। ভাগ্যবান নাবিক কিন্তু অযথা সময় নষ্ট না করে রাজার কাছ থেকে সব কথা শুনল। বুঝতে পারল সাগরদ্বীপের মতলববাজ রাজকুমারই চুরি করেছে রাজকন্যাকে। তাই রাজকন্যাকে উদ্ধার করার জন্য যাদুদড়ি নিয়ে সাগরদ্বীপের দিকে তার নৌকা ছেড়ে দিল।

সাগরদ্বীপ দীর্ঘ দু-দিনের পথ। ভাগ্যবান নাবিক তখন তার যাদুদড়ির সাহায্যে দ্রুততালে নৌকা চালিয়ে এসে পৌঁছাল সাগরদ্বীপের রাজ্যের খুবই কাছাকাছি। সাগরদ্বীপের তিনদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। আর যেদিক খোলা সেখানে আছে অসংখ্য ডুবো পাহাড়। সাগরদ্বীপের নাবিকেরা সেই ডুবো পাহাড় বাঁচিয়ে চলাচলের পথ জানে। অজানা নাবিকের সেই পথতো জানা সম্ভব নয়। তাই অজানা নাবিকের নৌকা ডুবো জাহাজে ধাক্কা লেগে প্রায়ই ভেঙ্গে যায়।

ভাগ্যবান নাবিক তার বুদ্ধির সাহায্যে বুঝতে পারল যে ডুবো পাহাড় আছে। তাই কিছুদূরে তার নৌকা নঙর করল। আর তারপর সাঁতরে রওনা হোল সাগরদ্বীপের দিকে।

এদিকে সাগরদ্বীপের সৈন্যরাও এইদিকে পাহারা দিচ্ছিল, নৌকা-গুলো একপাশে লুকিয়ে রেখে। ভাগ্যবান নাবিককে পাড়ের দিকে আসতে দেখেই তারা তাদের নৌকাগুলো ছেড়ে দিল ভাগ্যবান নাবিকের দিকে। কাছাকাছি এসে হাজার হাজার তীর ছুঁড়তে লাগল ভাগ্যবান নাবিকের দিকে। ভাগ্যবান নাবিক বুঝতে পারল সাগরদ্বীপের রাজপুত্রের হাতে তার আর রক্ষা নেই।

তাই আর উপায় না দেখে ভাগ্যবান নাবিক তার যাদুদড়ির

দুইটা গিঁট খুলে দিল। সংগে সংগেই সমুদ্র গর্জে উঠল, বাতাসের গতি দ্রুত বেড়ে গেল। ঝড়-তুফান সুরু হয়ে গেল। সেই বাতাসের গতিতে সাগরদ্বীপের নৌকাগুলো ডুবো পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে যেতে লাগল। তাদের সৈন্য সামন্ত ছিট্‌কে সমুদ্রে কোথায় যে পড়ে গেল তার কোন হিসাবই নেই। যে সব সৈন্য কোনও রকমে বেঁচে গেল তারা ডাঙ্গার দিকে পালিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ সেই সৈন্যদের আছড়ে ফেল্‌ল ডাঙ্গার উপর। তাদেরও কেউ আর বেঁচে রইল না। এদিকে ভাগ্যবান নাবিকের নৌকা ঢেউয়ের ধাক্কায় সাগর-দ্বীপের মাটিতে এসে পড়ল। কিন্তু যাদু-দড়ির জন্য নৌকা বা ভাগ্যবান নাবিকের কোন ক্ষতিই হোল না।

ভাগ্যবান নাবিক, যখন দেখল সাগরদ্বীপের পাহারাদার সৈন্যরা মারা পড়েছে, তাদের নৌকাগুলো ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে, তখন তার যাদুদড়ির তৃতীয় গিঁটটা খুলে দিল। সংগে সংগেই ঝড় শান্ত হোল। ভাগ্যবান নাবিক তখন ধীরে ধীরে সাগরদ্বীপের রাজপ্রাসাদের দিকে রওনা হোল।

এদিকে সাগরদ্বীপের মতলববাজ রাজপুত্রের কানে খবর পেঁাছে গেছে যে ভাগ্যবান নাবিক এসে পেঁাছছে, আর তার সব সৈন্য-সামন্তকে মেরে ফেলেছে। সেইশুনে সেই রাজপুত্র ভয়ে রাজ-প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে গেল, পাছে ভাগ্যবান নাবিক তাকেও মেরে ফেলে। ফলে রাজকন্যাকে উদ্ধার করা খুবই সহজ হোল ভাগ্যবান নাবিকের পক্ষে। ভাগ্যবান নাবিককে দেখে রাজকন্যার মুখে হাসি ফুটল। রাজকন্যা বুঝল যে ভাগ্যবান নাবিক যে কোনও শক্তিশালী রাজপুত্রের চেয়েও শক্তিশালী। রাজকন্যাকে উদ্ধার করে ভাগ্যবান নাবিক ফিরে এলো সিন্ধু-দ্বীপে। রাজার মুখে হাসি ফুটল রাজকন্যাকে দেখে। রাজ্যে হৈ-চৈ আনন্দ পড়ে গেল। তারপর খুব ধূমধাম করে রাজকন্যার

সংগে ভাগ্যবান নাবিকের বিয়ে হোল। রাজ্যের সমস্ত নাবিক, সমস্ত প্রজা সেই বিয়েতে যোগ দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ পেল রাজার কাছ থেকে। সবাই ভাগ্যবান নাবিকের জয়গান গাইল তার অদ্ভূত শক্তির জন্য।

বিয়ের পর বৃদ্ধ রাজা ভাগ্যবান নাবিককে ডেকে বল্লেন—

"বাবা, এবার তুমিই সিংহাসনে বস। আমি তো বুড়ো হয়েছি। আমি এবার বিশ্রাম নিই। আমার ছেলে তো তোমাকেই রাজ্য দিতে বলেছে। তা তুমি এবার রাজা হও।"

নাবিক কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বল্ল—

"দেখুন, রাজ্য নিয়ে আমি কি করব? রাজ্য চালাতে আমি জানিনা। আমি জানি নৌকা চালাতে, দেশ-বিদেশ ঘুরতে। তাতেই আমি খুশী। বহু রাজা আমি দেখেছি, রাজার ধনদৌলত দেখেছি, রাজাদের জীবন আমার ভাল লাগে না। রাজ্য চালাতে গেলে নানান ভাবে প্রজাদের বঞ্চিত করতে হয়। পাশাপাশি রাজ্যের সংগে মাঝে মাঝে যুদ্ধ করতে হয়। এসব আমার কিছুই ভাল লাগে না। তার চেয়ে রাজকন্যাকে নিয়ে আমার নৌকায় ফিরে যেতে দিন।"

রাজা ভাগ্যবান নাবিকের এই নির্লোভীতা দেখে আবার মুগ্ধ হলেন। তিনি বারবার তাকে আশীর্বাদ করলেন। ভাগ্যবান নাবিকদের মত এরকম :নির্লোভী অথচ ক্ষমতাশালী লোককে বিয়ে করতে পেরেছে বলে রাজকন্যাও খুব গর্ব বোধ করল। এরপর ভাগ্যবান নাবিক রাজকন্যাকে নিয়ে সিন্ধুদ্বীপ ছেড়ে রওনা হোল। একের পর এক বহুদেশ তারা ঘুরল। নানান্ সমুদ্র তারা পার হোল। কিন্তু যাদুদড়ির জন্য কোথাও কোন অসুবিধেই তাদের হোল না।

এইরকম করে বহু দিন, বহু বছর পার হোল। তারপর ভাগ্যবান নাবিকের এক ছেলে হোল। সে ছেলে দেখতে

ভাগ্যবান নাবিকের মতই সুন্দর। এদিকে রাজকন্যা ও ভাগ্যবান নাবিক বুড়ো হোতে সুরু করেছে। তখন তারা ঠিক করল ভাগ্যবান নাবিকের দেশে ফিরে গিয়ে সেখানেই বসবাস করবে। রাজকন্যা আর ছেলেকে নিয়ে ভাগ্যবান নাবিক নিজের দেশে ফিরে এল।

এরপর ভাগ্যবান নাবিক নৌকা নিয়ে সমুদ্রে যাতায়াত না করলেও তার সেই যাহ্দড়িকে যত্ন করেই রেখেছিল। ছেলে বড় হোলে তাকে যাহুদড়িটা দেবে এই তার ইচ্ছে।

ভাগ্যবান নাবিকের ছেলেরও ছোটবেলা থেকে নেশা জলের জন্য। তার ছোটবেলার মতই তার ছেলেকেও জল নদী সব সময়েই চুম্বকের মত টানত। হাতের কাছে যা কিছু পায় সবই নদীতে ফেলে দেয়, ভাবে এই বুঝি তার নৌকা ভাস্‌ছে, একদিন নাবিকের ছেলে হাতের কাছে পেল যাহ্দড়িটা। যাহুদড়িটা সে নদীতে ফেলে দিল সেটা তার নৌকা হয়ে ভেসে যায় কিনা দেখবার জন্য। আর সত্যিই যাহুদড়িটা নদীতে পড়ে ভেসে কোথায় চলে গেল।

আঃ, সেই দড়িটা যদি তোমাদের কারুর পড়ে কি :মজাই না হয় বল? তোমরা সবাই নদীর দিকে একটু নজর রেখো— যদি হঠাৎ যাহুদড়িটা দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে ভাগ্যবান নাবিকের মত একদিন রাজ্য আর রাজকন্যা হুটোই জুটে যেতে পারে তোমাদের ভাগ্যে। আঃ, সেদিন কি মজাই না হবে। মানুষের ভালবাসার কাছে রাজ্য সিংহাসনও কিছু নয়। সুখের চেয়ে শান্তিই বড়। ভাগ্যবান নাবিকই তার দৃষ্টান্ত।

বেড়ালদের রাজপ্রাসাদ

এক জমিদারের তিন ছেলে ছিল। বড় দুই ছেলেরা ছিল খুব ধুর্ত্ত কিন্তু ছোট ছেলেটা ছিল খুবই সৎ আর ভালমানুষ। দাদাদের মত চালাকি বুদ্ধি ছোটভাই-এর মাথাতে খেলত না। সে ছিল খুবই সাদাসিদে ধরণের, আর দয়ালুও। এই তিন ছেলেকে নিয়েই ছিল জমিদারের সংসার।

জমিদার নিজেও খুব হাসিখুশী আর ভালমানুষ ছিলেন। প্রজাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেন তাই জমিদারকে প্রজারাও ভালবাসত। ধীরে ধীরে বহু বছর কেটে গেল। একদিন জমিদার বুড়োও হলেন। জমিদার এইবার ঠিক করলেন ছেলেদের কাউকে জমিদারী চালাবার দায়িত্ব দিয়ে বিশ্রাম নেবেন। কিন্তু তিন ছেলের কার হাতে জমিদারী দেবেন এই হল জমিদারের চিন্তা।

চিন্তার কারণ, বড় ছেলে ছিল অত্যন্ত ধুর্ত্ত, আর লোভী। প্রজারা তাকে পছন্দ করে না। মেজ ছেলেও অত্যন্ত লোভী আর মতলববাজ। প্রজাদের সঙ্গে অকারণেই ঝগড়া করে। মেজ ছেলেকেও প্রজারা তাই পছন্দ করে না। কিন্তু ছোট ছেলে দয়ালু, সাদাসিদে ধরণের ছিল বলে প্রজাদের সবার সঙ্গেই তার খুব সদ্ভাব ছিল। সেই ছেলেকে প্রজারা তাই ভালবাসত। সেই কারণেই ছোট ছেলে ছিল জমিদারের প্রিয়। কিন্তু তাই বলে বড় আর মেজ দুই বড়ছেলে বর্ত্তমানে ছোট ছেলেকে তো আর জমিদারী দেওয়া সম্ভব নয়। তাই জমিদারের চিন্তারও

'রাজকন্যা উঠে এসে তার হাত ধরে—'

আর শেষ নেই। কি করেন, কাকে জমিদারী দেবেন? বড়, মেজ না ছোট ছেলে, কাকে?

শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে জমিদার ছেলেদের এক এক করে ডাকলেন, তাদের মতামত জানবার জন্য।

বড় ছেলে বল্ল—'আমি বড় ছেলে, তাই এই জমিদারী, এখানকার বাড়ী জমি-জায়গা সব আমারই প্রাপ্য।'

মেজ ছেলে বল্ল—'দাদা বড় হতে পারে কিন্তু প্রজারা কেউ দাদাকে চায় না। বরং তারা দাদার চেয়ে আমাকেই বেশী পছন্দ করে। তাই জমিদারী চালানোর দায়িত্ব আমারই পাওয়া উচিত।'

ছোট ছেলে, সেতো নেহাতই ভালমানুষ। সে বড় আর মেজ দাদাদের কথা শুনে তাদের সঙ্গে তর্ক না করে বল্ল—

"কে জানে, এই জমিদারী, তার বাড়ী-ঘর এসব কিছুরই ন্যায্য মালিক হয়ত একদিন আমিই হব। তবুও কিন্তু দাদাদের সঙ্গে যাতে ঝগড়া না হয় তার জন্য এসব কিছুই আমি নেব না। আমি শুধু চাই বাবার সেই বাদামী রঙের বুড়ো ঘোড়াটাকে আর তার সঙ্গের কাঠের গাড়ীটাকে। এ দুটো পেলেই আমি খুশী।"

ছোট ভাই-এর কথা শুনে বড় আর মেজ ভাই কেউই আপত্তি করল না। একটা বুড়ো ঘোড়া আর তার কাঠের গাড়ীটাকে নিয়ে ছোট ভাই যদি খুশী হয় ওদের তাতে কোন আপত্তিই নেই। কিন্তু বড় আর মেজ ভাই-এর মধ্যে ঝগড়া চলতেই লাগল। বড় বলে জমিদারী আমার প্রাপ্য আর মেজ বলে জমিদারী তারই পাওয়া উচিত।

জমিদার যখন দেখলেন বড় দুই ছেলের ঝগড়া কিছুতেই থামবার নয়, তখন তিনি তিন ছেলেকেই আবার ডেকে পাঠালেন। বল্লেন,—

"দেখ, তোমরা বড় দুইজনে যে মিলেমিশে স্থির করবে জমিদারী কার প্রাপ্য তার কোন আশাই দেখছি না। তোমরা বড় দুইজনে সমানেই ঝগড়া করে চলেছ জমিদারী নিয়ে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে এর ফয়সলা এক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে করব বলে স্থির করেছি। যে এক মাসের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর একটা রুমাল আনতে পারবে তাকেই আমি আমার জমিদারী দিয়ে দেব। একথা কিন্তু মনে রেখো রুমালটা এমন হওয়া চাই যে সেরকম রুমাল এর আগে কেউ কখনও দেখেনি।"

বাবার এই কথা শুনে বড় আর মেজো ভাই-এর ঝগড়া বন্ধ হল। দুজনেই মনে মনে ভাবল এই অপূর্ব রুমাল শুধু সেইই আনতে পারবে, ফলে জমিদারীও সেই-ই পাবে।

বাবার কথামত সবচেয়ে সুন্দর রুমাল আনবার জন্য বড় আর মেজো দুই ভাই তৈরী হোল। পরের দিন সকালে জমিদারের সবচেয়ে তেজী আর দামী ঘোড়া দুটোকে নিয়ে আর তার সংগে প্রচুর সোনা-দানা নিয়ে দুই ভাই রওনা হোল। বড় ভাই জমিদার বাড়ীর উত্তর দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, আর মেজো ভাই রওনা হোল দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে। বড় ভাই গেল জমিদারীর উত্তর দিকে, আর মেজো ভাই গেল দক্ষিণ দিকে। দু-ভাই দুদিকে রওনা হোয়ে গেল, কিন্তু ভাল মানুষ ছোট ভাই একচুলও নড়াচড়া না করে বৃদ্ধ জমিদারের কাছেই থেকে গেল।

বৃদ্ধ জমিদার ভালমানুষ, দয়ালু স্বভাবের ছোট ছেলেকে স্নেহ করতেন সবচেয়ে বেশী তার সদ্গুণের জন্য। তাই তিনি তার ছোট ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন,—

"কিরে, তুই কি তোর দাদাদের মত রুমালটি খুঁজে একবার ভাগ্য ফেরাবার চেষ্টা করবি না?"

ছোট ছেলে মিষ্টি হেসে বল্ল—"তুমি তো জানই বাবা, দুই দাদা

রাজ্যের চতুর্দিকে তোলপাড় করে অপূর্ব রুমাল খুঁজছে। রাজ্যের কোন জায়গা খুঁজতে কি তারা বাকী রাখবে? সেজন্য রুমাল খুঁজতে আমি আর কোন জায়গায় যাব বল? তার চেয়ে এই কয়দিন আমি তোমার কাছেই থাকি। এই কয়দিন শুধু একলাই তোমার ভালবাসা আদায় করে নিই, সেটাই তো আমার সবচেয়ে বড় লাভ।"

ছোট ছেলের এই সুন্দর কথা শুনে বৃদ্ধ জমিদারের খুব ভাল লাগল। কিন্তু ছোট ছেলের এই ভালমানুষী দেখে তার দুঃখও হোল। জমিদার বুঝতে পারলেন তার জমিদারীটা হয়ত বড় ছেলে কিংবা মেজো ছেলে এই দু'জনের কোন একজনের হাতেই যাবে। লোভী স্বার্থপর ছেলেদের হাতে পড়ে জমিদারীটা তখন নষ্টই হয়ে যাবে। কিন্তু তার করবার আর কি আছে। ছোট ছেলেটা তার কাছ ছেড়ে কোথাও যাবে না, ফলে জমিদারীটা কোনভাবেই তখন ছোট ছেলেটা পাবে না। বৃদ্ধ জমিদারের তখন চুপ করে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।

এরপর ধীরে ধীরে এক-একটা দিন কেটে যায়। এক মাস হোতে তখন আর মাত্র চারদিন বাকী। বড় দুই ভাই-এর ফেরার সময়ও প্রায় হয়ে এসেছে। তখন ছোট ছেলে বাবাকে বল্ল—"দাদারা সমস্ত রাজ্য জুড়েই তো রুমাল খুঁজল। এবার দেখি একবার, আমি কোনও ভাল রুমাল খুঁজে আনতে পারি কিনা। ভাগ্য সহায় হোলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। তুমি আশীর্বাদ কর বাবা তাহলেই ভাগ্য আমার সহায় হবে।"

ছোট ছেলের এই সুন্দর কথায় বৃদ্ধ জমিদারের খুব ভাল লাগল। তিনি ছোট ছেলেকে বারবার আশীর্বাদ করলেন। তারপর ভালমানুষ ছোট-ছেলে বাবার বাদামী রঙের বুড়ো ঘোড়াটাকে আস্তাবল থেকে বার করল। তাকে আদর করে তাতে জীন পরালো। তারপর কাঠের গাড়ীটাকে ঘোড়ার

সংগে জুড়ে জমিদার প্রাসাদের পূর্বদিকের দরজা দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ল।

ছোট ছেলেটা ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে ভেবেই পাচ্ছিল না কোন্ দিকে সে যাবে। তাই ঘোড়ার লাগামটা আলগা করে ছেড়ে দিয়ে সে ঘোড়ার উপর চুপ করে বসে থাকল। বাদামী বুড়ো ঘোড়াটাও নিজের ইচ্ছেয় আস্তে আস্তে চলতে লাগল।

ঘোড়াটা ছোট ছেলেটাকে নিয়ে চলতে চলতে রাজ্যের সীমানার শেষে এক গভীর জংগলের মধ্যে এসে ঢুকল। জংগলের মধ্যে কিছুটা যাওয়ার পর ছেলেটা দেখল রাস্তাটা দুইদিকে চলে গেছে। বাঁদিকে যে রাস্তাটা গেছে সেটা চওড়া, দেখলেই বোঝা যায় সে রাস্তায় লোক চলাচল করে। আর ডানদিকের রাস্তাটা ভীষণ সরু। সে রাস্তায় লোকজন চলবার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। ছেলেটা ঠিক করল সে ঘোড়াটাকে নিয়ে বাঁদিকের চওড়া রাস্তা ধরেই যাবে। এই ভেবে সে লাগাম টেনে তার বাদামী ঘোড়াটাকে বাঁদিকের রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু বুড়ো ঘোড়া কিছুতেই বাঁদিকের রাস্তায় যেতে চাইল না। ঘোড়াটা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। ছেলেটা তখন আর কি করে। মনে মনে বল্ল—"ঠিক আছে, 'বাদামী' তোর যা ইচ্ছে তাই কর। তোর যেদিকে ইচ্ছে সেদিকেই চল।"

বাদামী বুড়ো ঘোড়া আস্তে আস্তে ডানদিকের সরু রাস্তা ধরেই চলতে লাগল। সরু রাস্তা ধরে যেতে যেতে জংগল ক্রমেই গভীর হতে লাগল। গভীর জংগলের মাঝখানে কোনও লোক-জনের শব্দ নেই, আলোর চিহ্ন নেই। বুড়ো বাদামী ঘোড়া কিন্তু না থেমে সেই সরু পথ ধরে অন্ধকারের মধ্যেই আরও গভীর থেকে গভীরতর জংগলে যেতে লাগল। যেতে যেতে একসময়ে একটা অল্প আলো দেখতে পাওয়া গেল। তারপর

সেই আলো লক্ষ্য করে চলতে চলতে তারা এসে পৌঁছাল এক বিরাট প্রাসাদের সামনে।

প্রাসাদের সামনে এসে ছেলেটা যখন ঘোড়া থেকে নেমে প্রাসাদের ভিতর ঢুকতে যাবে তখন দেখল কোথা থেকে ছুটো বিরাট বন বিড়াল সামনে এসে দাঁড়াল। বন বিড়াল ছুটো এসে দাঁত বার করে তাকে ভয় দেখাতে লাগল। বেড়াল ছুটোর চোখগুলো রাগে বন্‌বন্ করে ঘুরছিল। এই দেখে ভাল মানুষ ছেলেটার মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। সে বুঝে উঠতে পারছিল না, সে কি করবে। তখন সে মনে মনে ভাবল যদি সে ঐ প্রাসাদের ভিতর না গিয়ে জংগলের মধ্যে থেকে যায় তবে নেকড়ের হাতে নিশ্চয়ই তারা মারা পড়বে। তার চেয়ে প্রাসাদের ভিতর ঢুকতে গেলে বন বিড়াল ছুটো বাধা দিলেও লড়াইতো করা যাবে। এই ভেবে ছেলেটা ঘোড়া থেকে নেমে বিড়াল ছুটোর দিকে না তাকিয়ে ধীরে-সুস্থে প্রাসাদের ফটক দিয়ে প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ফটক পার হয়ে প্রাসাদের মধ্যে ঢোকার সংগে সংগেই বন বিড়াল ছুটোর ভয় দেখানোও বন্ধ হয়ে গেল। আর বড় বড় চোখ করে ভয় না দেখিয়ে ছেলেটার পায়ের কাছে এসে লুটোপুটি খেয়ে আদর করে তাদের গা ঘসতে লাগল। তারপর বন বিড়াল ছুটোই তাকে পথ দেখিয়ে প্রাসাদের ভিতরে নিয়ে গেল।

বেড়াল ছুটোর সংগে সে আর বাদামী প্রাসাদের ভিতরকার বাগানে এসে পৌঁছল। তখন দেখল অসংখ্য ছোট-বড় বিড়াল তাকে ঘিরে ধরল। আর কি অদ্ভুত ব্যাপার! সবাই মানুষের মত তার সংগে কথা বলতে শুরু করল। সাদা-কালো ছোট-বড় বিড়ালরা সবাই মিলে তাকে খুব আদর করে রাজপ্রাসাদের ভিতর নিয়ে গেল। আর তার বুড়ো বাদামী

রঙের ঘোড়াটাকেও যত্ন করে প্রাসাদের আস্তাবলে নিয়ে গেল। সেই অসংখ্য ছোট-বড় বেড়ালরা ভালমানুষ ছেলেটাকে খুশী করবার জন্য সবরকম চেষ্টা করতে লাগল।

পরের দিন সকাল বেলায় ছেলেটা বিড়ালদের সেই প্রাসাদ থেকে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হোল। কিন্তু তখন সমস্ত বিড়ালরা তাকে ঘিরে ধরল। তারা বারবার কাতরভাবে অনুরোধ করল আরও কিছুক্ষণ তাদের সংগে থেকে যাওয়ার জন্য। বিড়ালদের এই অনুরোধে ভালমানুষ ছোট ছেলে বল্ল—"দেখ বিড়াল ভাই বোনেরা,—তোমাদের এখানে থেকে যেতে আমার একটুও আপত্তি নেই। তোমরা সবাই আমাদের এত আদর-যত্ন করেছ সে কি ভুলতে পারি? কিন্তু কি করব, আমার হাতে যে আর মাত্র তিনদিন সময় আছে। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা রুমালটা নিয়ে যদি বাবার কাছে ফিরতে না পারি তাহলে বাবার জমিদারীটা আমি পাব না, পাবে দুই দাদার মধ্যে কোনও একজন।" —এই বলে সে বিড়ালদের রুমালটার সম্বন্ধে সব কিছু খুলে বল্ল।

সব শুনে ওদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দেখতে ধবধবে সাদা বিড়ালটা বল্ল—"ওঃ, এই কথা। এতো খুবই সোজা কাজ। তুমি আমাদের সংগে আরও তিনদিন থাক। তারপর এমন সুন্দর রুমাল দিয়ে দেব যা তোমার দুই দাদা কল্পনাও করতে পারবে না। তাছাড়া আরও যা জিনিষ চাও তাও পাবে।"

সাদা বেড়ালটার এই কথা শুনে ছোট ছেলে খুশী হয়ে বেড়ালদের সঙ্গে ওদের প্রাসাদে তিনদিনের জন্য থেকে গেল। বেড়ালরা তাকে রাজার আদরে রেখে দিল। তারা ওকে ভাল ভাল খাবার, ভাল বিছানা দিল। ওর সব কিছু কাজ করে দিল। তার বদলে ছোট ছেলেটার কাজ হল বেড়ালদের সঙ্গে মজার মজার গল্প করা, খেলাধূলা করা। এই রকম ভাবে

আনন্দে ছোট-ছেলে আর বেড়ালরা তিনটে দিন কাটিয়ে দিল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যেবেলায় বেড়ালরা ভালমানুষ ছোট ছেলেটার বাদামী বুড়ো ঘোড়াটাকে আস্তাবল থেকে নিয়ে এল। যত্ন করে তাকে ঘাস ছোলা-দানা খাইয়ে তারপর তাকে জীন পড়ালো আর কাঠের গাড়ীটাকে তার সঙ্গে জুড়ে দিল। এরপর সুন্দর সাদা বেড়ালটা ছেলেটাকে একটা ছোট্ট বাদাম দিয়ে বিদায় দেওয়ার সময় বল্ল—

“দয়ালু ছেলে তুমি আমাদের সবাইকে এই কয়দিন খুব আনন্দ দিয়েছ। তাই তুমিও খুশী মনেই বাড়ী ফিরে যাও। আমরা বলছি, তোমার সব ভাল হবে। তোমাকে যে ছোট্ট বাদামটা দিলাম সাবধানে তাকে রেখো। পথে যেতে যেতে এই বাদামটা ভেঙ্গো না কিন্তু। জমিদারের সামনে, তোমার দাদাদের সামনে বাদামটাকে ভাঙ্গবে, তাহলে তুমি যা চাইছ তাই পাবে।”

এরপর ছোট ছেলে তার “বাদামী”-র পিঠে চড়ে বসল। তারপর লাগামটায় টান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুড়ো ঘোড়া বাদামী চক্ষের পলকে ঝড়ের গতিতে তাকে নিয়ে এসে পৌঁছাল তাদের জমিদার বাড়ীর পূবদিকের ফটকের সামনে।

ইতিমধ্যে বড় আর মেজোভাই কিন্তু বৃদ্ধ জমিদারের কাছে ফিরে এসেছে। ফিরে এসে তাদের আনা রুমালদুটো তারা বাবাকে দেখাচ্ছে। দুটো রুমালই দেখতে বেশ সুন্দর। কিন্তু কোনটা বেশী ভাল বোঝা যাচ্ছিল না। এই রুমাল খুঁজে বার করতে বড় আর মেজোভাইকে কম পরিশ্রম করতে হয়নি। মাত্র একমাসের মধ্যে রাজ্যের প্রত্যেকটা জায়গা খুঁজে তবে তো তারা এ রুমাল দুটো এনেছে। এর জন্যে তারা না পেয়েছে খাবার সময়, আর না পেয়েছে বিশ্রাম ঠিকমত। তাই বড় আর মেজো দুই ভাইকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। আর

তাদের তেজী ঘোড়াদুটোও এই দীর্ঘ পরিশ্রমে হাপাচ্ছিল।

এই সময় ভালমানুষ ছোট ছেলে পূব দিকের ফটক দিয়ে জমিদার প্রাসাদের মাঠে এসে দাঁড়াল। বুড়ো ঘোড়া বাদামী জোর কদমেই ছুটে এতটা পথ এসেছে। কিন্তু ছোট ছেলে আর তার বুড়ো ঘোড়া বাদামী দুজনেই তো এই কয়দিন প্রচুর আরামে ছিল। তারা ভাল ভাল খাবারও খেয়েছে তিন দিন। তাই তাদের দুজনকেই খুব উৎফুল্ল আর ঝকঝকে দেখাচ্ছিল। তাদের চেহারায় কোন ক্লান্তির ছাপই ছিল না।

জমিদার ছোট ছেলেকে দেখে বল্ল—"বাঃ তুমি যেখানেই এই কদিন থাক না কেন বেশ আরামেই ছিলে দেখছি, অবশ্য জানিনা, কোনও সুন্দর রুমাল, যা আনবার জন্য তুমি গিয়েছিলে তা আনতে পেরেছ কিনা।"

ভালমানুষ ছোট ছেলেটা সুন্দর হেসে বল্ল—

"ঠিক বলেছ বাবা, আমি আর বাদামী খুব আরামেই ছিলাম। আর রুমাল তো এনেছিই।"

এই বলে ছোট বাদামটা পকেট থেকে বার করল। তারপর আস্তে করে টোকা দিয়ে ওটা ভাঙ্গল। আর সংগে সংগে ভিতর থেকে একটা অপূর্ব সুন্দর রুমাল বেরিয়ে পড়ল। সে রুমালের সূতোগুলো হচ্ছে রুপোর তারের। ফুলগুলো হচ্ছে সোনার-জরির। তাতে দু-একটা হীরে ঝলমল করছে। রুমালটার অপূর্ব আভায় সমস্ত ঘরটা আলোয় ভরে গেছে।

এই রুমাল দেখে বড় আর মেজোভাই-এর চোখেও পলক পড়ছে না! তারাও রূপোর সূতোর কাজ করা আর তাতে সোনার ফুল ও হীরের কুঁড়িতে ঝলমল করা রুমালটা দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকে।

জমিদারের মুখেও তখন হাসি ফোটে। তিনি তো সব সময়েই চাইছেন যে দয়ালু নির্লোভী ছোট ছেলেটাই জমিদারী পাক।

প্রজাদেরও তো ইচ্ছে তাই। তাই এবার তিনি বল্লেন,—
"ছেলেরা এবার তোমরাই নিজেরা বিচার কর জমিদারী এখন কার প্রাপ্য? তোমাদের না ছোট ভাই-এর? ছোটর আনা রুমাল শুধু অপূর্ব নয়, অনবদ্য। এরকম সুন্দর রুমাল আমরা কেন, পৃথিবীতেও কেউ দেখেছে কিনা সন্দেহ। তাই ছোট ছেলেই এখন জমিদারী পাবার যোগ্য।"

বাবার এই কথা বড় বা মেজো ছেলে কেউই অস্বীকার করতে পারল না। সত্যিই ছোটর আনা অপূর্ব রুমালের জ্যোতিতে ঘরটা ভরে আছে। আর এও ঠিক সবচেয়ে সুন্দর রুমাল যে আনবে সেই জমিদারী পাবে। তবুও বড় আর মেজো হিংসেয় জ্বলে যেতে লাগল এই ভেবে যে ছোট ভাইটাই জমিদারী পাবে কেন।

তাই রাগে হিংসেয় দুই ভাই বল্ল—"নাঃ, সুন্দর রুমাল আনলেও, ছোট কিছুতেই জমিদারী পাবে না। আমরা বড়, জমিদারী তাই পাওয়া উচিত আমাদের মধ্যে কোনও একজনের।"

হিংসুক দুই ছেলের এই কথা শুনে বৃদ্ধ জমিদার তো অবাক। তার দুই ছেলে যে এতটা লোভী তা তার জানা ছিল না। তার কথামত ছোট ছেলেরই এবার জমিদারী পাওয়া উচিত। বাবার এই অসহায় অবস্থা দেখে ছোট ভালমানুষ ছেলে বল্ল—
"দেখো এই জমিদারী যদি আমি না পাই তো নাই পেলাম। অবশ্য ন্যায়তঃ এই জমি-জায়গা আর প্রাসাদ এখন আমারই হওয়া উচিত কেননা আমিই সবচেয়ে সেরা রুমালটা আনতে পেরেছি। তবুও দাদারা দুজনে যখন চাইছে তখন জমিদারী তারাই নিক। আমাকে শুধু ঐ বুড়ো ঘোড়া বাদামীকে আর তার কাঠের গাড়ীটাকে দাও তাহলেই হবে। ভাগ্য যদি সহায় হয় তবে জিৎ আমারই হবে।"

ছোট ছেলের এই উদারতা দেখে বৃদ্ধ জমিদার খুব খুশী হলেন, কিন্তু দুঃখও পেলেন খুব। দুঃখ পেলেন এই ভেবে জমিদারিটা বড় বা মেজো দুজনের কারুর হাতে চলে যাচ্ছে বলে। দুজনেই লোভী হিংসুক আর প্রজারাও সেজন্য দুজনকেই অপছন্দ করে। কিন্তু তখন বৃদ্ধ জমিদারের করণীয় তো আর কিছু নেই। তিনি চুপ করেই থাকলেন, ভাবলেন এতে যদি শান্তি আসে তবে তাই হোক্।

বড় দুই ভাই ছোট ভাইকে বল্ল—"তুই নিয়ে নে বাদামী ঘোড়া আর তার গাড়ীটাকে।"—কিন্তু জমিদারিটা বড় নেবে না মেজো নেবে তার কিন্তু ফয়সলা একটুও হোল না। বড় ভাই আর মেজ ভাই-এর মধ্যে মালিকানা নিয়ে ঝগড়া চলতেই থাকল।

বড় ভাই বলে—"আমি বড়। এই জমিদারী, প্রাসাদ, সব আমার পাওয়া উচিত।"

মেজ ভাই বলে—"নাঃ, কিছুতেই না, এসব আমি পাব। আমি কিন্তু তোর চেয়ে বেশী পড়াশুনা করেছি, তাই আমিই জমিদারী চালাতে পারব, তুই পারবি না।"

বড় দুই ভাই-র এই ঝগড়া ক্রমে বাড়তেই থাকল। বড় বলে জমিদারী আমার। আর মেজো বলে আমার। বৃদ্ধ জমিদার বড় দুই ছেলেকে বারবার অনুরোধ করল নিজেরা এর ফয়সলা করে নিক ধীর-স্থির ভাবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। তারা দুজনে ঝগড়াই করে চলেছে। শেষে আর থাকতে না পেরে বৃদ্ধ জমিদার রেগে গিয়ে বল্লেন—

"দেখ তোমরা বড় দুজনে কেউই যখন কোনও ফয়সলা করবে না তখন আমি যা বলব তাই মানতে হবে। ছোট ভাই এর মত উদার মন তোমাদের নয়। তাই নিজেদের মধ্যে ফয়সলা করে নেবার ক্ষমতাও তোমাদের নেই। তাই তোমাদের কারুর কিছু ফয়সলা করবার দরকার নেই। আমিই ফয়সলা করব।

শোন—এই জমিদারী, প্রাসাদ একদিন তোমাদের মধ্যে কেউ একজন হয়ত পাবেই। জমিদারী পাবার পর তাকে বিয়েও করতে হবে। তাই বিয়ের সময় কনেকে দেওয়ার জন্য সবচেয়ে সুন্দর গলার হার যে আনতে পারবে এই রাজ্য সবকিছু পাবে সেইই। তবে মনে রেখো, হারটা এমন হওয়া চাই যে এর আগে সেরকম সুন্দর হার কেউ কখনও দেখেনি। আর এক-মাসের মধ্যেই সেটা আনতে হবে।"

বাবার এই কথা শুনে বড় আর মেজর মুখে হাঁসি ফুটল, ঝগড়া বন্ধ হোল। তুজনেই মনে মনে ভাবল এই অপূর্ব হার সেইই শুধু আনতে পারবে, ফলে জমিদারী পাবে সেইই।

সবচেয়ে সুন্দর হার আনবার জন্য বড় আর মেজো তুই ভাই সবচেয়ে তেজী আর দামী ঘোড়াতুটোকে নিয়ে রওনা হোল। সংগে কিন্তু প্রচুর সোনা-দানাও নিয়ে যেতে ভুল্ল না, হার আনতে টাকা পয়সাতো লাগবেই। বড় ভাই জমিদারবাড়ীর উত্তর দিকের ফটক দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে রাজ্যের উত্তরদিকে চলে গেল। আর মেজো ভাই গেলো দক্ষিণ দিকে, প্রাসাদের দক্ষিণ দিকের ফটক দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে। তুভাই তো তুদিকে গেল, কিন্তু ভালমানুষ ছোট ভাই এক চুলও নড়াচড়া করল না। সে বৃদ্ধ জমিদারের কাছেই থেকে গেল।

বৃদ্ধ জমিদারের আদরের ছোট ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন—

"কিরে, তুই কি তোর দাদাদের মত একবার দেখবিনা হারটা তুই আনতে পারিস কিনা?"

ছোট ছেলে মিষ্টি হেসে বল্ল—"তুমিতো জানই বাবা, অপূর্ব হারটা খুঁজবার জন্য তুই দাদা সমস্ত রাজ্য তোলপাড় করছে। রাজ্যের সব জায়গাইতো তারা খুঁজবে। ফলে আমার খুঁজতে যাওয়ার জন্য কোন জায়গাই পড়ে থাকবে না। তার চেয়ে এই কয়দিন আমি তোমার কাছেই থাকি। এই কয়দিন শুধু

একলাই তোমার ভালবাসা আদায় করি। সেটাই তো আমার সবচেয়ে বড় লাভ।"

ছোটছেলের এই কথা শুনে বৃদ্ধ জমিদারের চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না।

এরপর ধীরে ধীরে দিন কেটে যায়। একমাস পূর্ণ হতে তখন আর চারদিন বাকী। বড় দুই ভাই-এর ফেরবার সময়ও প্রায় হয়ে এসেছে। তখন ছোট ছেলে বাবাকে বল্ল—

"কি বল বাবা, দাদাদের খোঁজা এতদিনে নিশ্চয় শেষ হয়েছে। এবার আমি খুঁজতে বেরুলে দাদারা বোধ হয় আর রাগ করবে না। দেখি একবার চেষ্টা করে, সুন্দর হার আমি জোগাড় করতে পারি কিনা। ভাগ্য সহায় হলে অসম্ভবও হয়ত সম্ভব হতে পারে। আর তুমি যদি আশীর্বাদ কর বাবা, তবে ভাগ্য আমার সহায় হবেই।"

ছোট ছেলের এই সুন্দর কথায় বৃদ্ধ জমিদারের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি নির্লোভী, ধীর-স্থির ছোট ছেলেকে বারবার আশীর্বাদ করলেন। তারপর ছোট ছেলে আস্তাবল থেকে বাদামী রঙের বুড়ো ঘোড়া 'বাদামী'কে বের করে এনে তাকে আদর করল। তাতে জীন পড়ালো, আর কাঠের গাড়ীটাকে তার সংগে জুড়ে দিল। এরপর জমিদারবাড়ীর পূব-দিকের ফটক দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে রাজ্যের পূব দিকে চলতে সুরু করল।

ছোট ছেলে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এবারও বুঝতে পারছিল না কোনদিকে যাবে। কিন্তু আগের-বার "বাদামী"-ঘোড়া তাকে ঠিক রাস্তায় নিয়ে গিয়েছিল বলে সে এবারও ঘোড়ার লাগামটা আলগা করে দিল। এবারও সে ভাবল দেখাই যাক্ না বুড়ো বাদামী তাকে কোনদিকে নিয়ে যায়। এবার কিন্তু লাগাম আলগা করা মাত্রই বুড়ো ঘোড়া জোর কদমে ছুটতে সুরু

করল। এ অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে চুপ করে বসে থাকা ছাড়া ছোট ছেলেটার আর কোন উপায়ও ছিল না।

ছুটতে ছুটতে সন্ধ্যের সময় বুড়ো বাদামী ঘোড়া ছোট ছেলেকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে বিড়ালদের সেই রাজপ্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আগের বারের মতই দুটো বড় বড় বন-বেড়াল প্রাসাদের দরজার সামনে বসে দাঁত বার করে ভয় দেখাচ্ছে আর বড় বড় চোখ দুটো দিয়ে বিভৎসভাবে তাকিয়ে আছে। দেখলেই যে কোন মানুষের বুকের রক্ত হীম হয়ে যায়। কিন্তু এসব দেখেও ছোট ছেলেটা এবার একটুও ভয় পেল না। বরং প্রাসাদের ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই বন-বেড়াল দুটোর ভয় দেখানো বন্ধ হয়ে গেল। আর ছেলেটার পায়ের কাছে এসে লুটোপুটি খেয়ে আদর করে তাদের গা ঘসতে লাগল। তারপর বেড়াল দুটো আগের মতই তাকে পথ দেখিয়ে প্রাসাসের ভিতরে নিয়ে গেল।

প্রাসাদের ভিতরের বাগানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আগের মতই অসংখ্য বড়-ছোট, সাদা-কালো ধূসর রঙের বেড়াল তাকে ঘিরে ধরল। সবাই মিলে আনন্দে লাফালাফি করতে সুরু করল। তারপর তারা সবাই মিলে রাজার মত সমাদরে তাকে প্রাসাদের ভিতরে নিয়ে গেল। বুড়ো "বাদামী"কে যত্ন করে নিয়ে গেল আস্তাবলে। আর বাদামীকে খেতে দিল ভাল দামী ছোলা, কচি কচি ঘাস।

পরদিন সকাল বেলায় ছেলেটা বেড়ালদের সেই প্রাসাদ থেকে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। তখন সমস্ত বেড়ালরা আগের মতই তাকে ঘিরে ধরল। বারবার কাতরভাবে অনুরোধ করল আরও কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে থেকে যাওয়ার জন্য। বেড়ালদের এই অনুরোধে ভালমানুষ ছোট ছেলে বল্ল—

"দেখ বেড়াল ভাই-বোনেরা, তোমাদের এখানে থেকে যেতে

আমার একটুও আপত্তি নেই। তোমরা সবাই এত আদর-যত্ন করেছ সে কি আমি কখনও ভুলতে পারি। কিন্তু কি করব, আমার হাতে যে আর মাত্র তিন দিন সময় আছে। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা হার নিয়ে বাবার কাছে ফিরতে না পারলে বাবার জমিদারিটা আমি পাব না, পাবে দাদাদের মধ্যে কেউ একজন।"—এই বলে সে হারটার সমস্ত কথা বেড়ালদের খুলে বল্ল।

সব শুনে ওদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দেখতে ধব্‌ধবে সাদা যে বিড়ালটা ছিল সে বল্ল—

"ওঃ এই কথা, এতো খুবই সোজা কাজ। তুমি আমাদের সংগে আরও তিনদিন থাক তারপর তোমাকে এমন সুন্দর একটা হার দিয়ে দেব যা তোমার দুই দাদা কল্পনাও করতে পারবে না। তাছাড়া, আর যদি কিছু চাও তুমি তাও পাবে।"

সাদা বেড়ালটার এই কথা শুনে ছোট ছেলে খুশী মনেই বেড়ালদের সংগে ওদের প্রসাদে তিনদিনের জন্যে থেকে গেল। বেড়ালেরা রাজার আদরেই ওকে রেখে দিল। ছেলেটার বাদামী ঘোড়াটাকেও যত্ন আত্তি করতে ভুল্ল না। বেড়ালের প্রাসাদে হাজার হাজার সাদা কালো ছোট বড় বেড়ালদের সংগে হৈ-চৈ আনন্দ করে—ছোট ছেলে তিনদিন কাটিয়ে দিল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যে বেলায় বেড়ালেরা ভালমানুষ ছেলের "বাদামী"কে আস্তাবল থেকে নিয়ে এল। যত্ন করে গায়ে পিঠে আদর করে তারপর তাকে জীন পড়িয়ে তার সংগে গাড়ীটাকে জুড়ে দিল। এরপর সুন্দর সাদা বেড়ালটা ছোট ছেলেকে একটা ছোট বাক্স দিয়ে বল্ল—

"দয়ালু ছেলে, তুমি আমাদের সবাইকে এই কয়দিন খুব আনন্দ দিয়েছ। তাই তুমিও খুশী মনে বাড়ী ফিরতে পার, দেখবে তোমার সব ভাল হবে। তোমায় যে বাক্সটা দিলাম

সাবধানে রেখো পথে যেতে যেতে বাক্সটাকে খুলো না কিন্তু। জমিদারের সামনে, তোমার দাদাদের সামনে বাক্সটাকে খুলবে, তাহলেই তুমি যা চাইছ তাই পাবে।”

ছোট্ট বাক্স নিয়ে বাদামীর পিঠে চড়ে ছোট ছেলে বেড়ালদের প্রাসাদ থেকে রওনা হোল। বাদামীর পিঠে চড়ে তার লাগামটায় টান দেওয়া মাত্র বুড়ো বাদামী চক্ষের পলকে ঝড়ের গতিতে তাকে নিয়ে এসে পৌঁছাল তাদের জমিদার বাড়ীর পূব দিকের ফটকের সামনে।

ইতিমধ্যে বড় আর মেজো ভাই কিন্তু ফিরে এসেছে জমিদারের কাছে। তাদের হার দেখাচ্ছে জমিদারকে। বড় ভাই এনেছে হীরে মোতির মালা, দেখতে খুবই সুন্দর। মেজো ভাই এনেছে চুনী পান্নার মালা তার চেহারাও সুন্দর। হার দুটোর মধ্যে কোনটা যে বেশী ভাল বুঝে ওঠাই মুস্কিল। জমিদারও তাই বুঝে উঠতে পারছিলেন না কার হারটাকে বেশী সুন্দর বলবেন।

এই হার খুঁজে বার করতে বড় আর মেজো ভাইকে তো কম পরিশ্রম করতে হয়নি। এই অল্প সময়ের মধ্যে দেশ-বিদেশের প্রত্যেকটা জায়গা খুঁজে তবে তো এই হার দুটো আনতে হয়েছে। এরজন্য ঠিকমত খাওয়া, ঠিক সময়ে বিশ্রাম কোন কিছুই হয়নি। তাই বড় আর মেজো দুইভাইকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। তাদের তেজী ঘোড়াদুটোও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ঠিক এই সময় ভালমানুষ ছোট ছেলে পূব দিকের ফটক দিয়ে জমিদার প্রাসাদের মাঠে এসে দাঁড়াল। এতটা পথ ছুটে এসেও বুড়ো ঘোড়া “বাদামী” টগবগ করেই চলছিল। ছোট ছেলে আর “বাদামী” দুজনে এ তিনদিন বেড়ালের প্রাসাদে প্রচুর আরামেই ছিল তাই তাদের একটুও ক্লান্ত না দেখিয়ে বরং ঝকঝকেই দেখাচ্ছিল।

জমিদার ছোট ছেলেকে দেখে বল্লেন,—"বাঃ তুমি বেশ আরামেই ছিলে দেখছি। অবশ্য জানিনা, কোনও সুন্দর হার যা আনবার জন্য তুমি গিয়েছিলে তা আনতে পেরেছ কিনা।"
ছোট ছেলে সুন্দর করে হেসে বল্ল—
"ঠিক বলেছ বাবা, আমি আর বাদামী দুজনে খুব আরামেই ছিলাম। আর হার কেন আনব না, তাও তো এনেছি।"
এই বলে সাদা-সুন্দর বেড়ালের দেওয়া ছোট্ট বাক্সটা পকেট থেকে বার করল। তারপর আস্তে করে বাক্সটা খুলে ফেল্ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই—ভিতর থেকে অপূর্ব সুন্দর গজমতীর হার বেড়িয়ে পড়ল। সে হারের সুতোগুলো হচ্ছে পাতলা সোনার তারের। হারের মধ্যিখানে ঝুলছে একটা নিটোল গজমতী আর তার চারধারে অসংখ্য রক্তমুখী হীরে। হারের দ্যুতিতে সমস্ত ঘরটা আলো হয়ে আছে।
ছোট ভাই-এর আনা গজমতির হার দেখে বড় আর মেজো রাজকুমার অবাক হয়ে গেল। কি অপূর্ব সেই হার, এ যেন স্বর্গের রাজকন্যার জন্যই শুধু তৈরী হয়েছে। এই হারের কাছে তাদের আনা হার দুটো যেন কিছুই না।
জমিদারের মুখেও হাসি ফুটল এবার। তিনি বল্লেন,—
"ছেলেরা তোমরাই এবার বিচার কর জমিদারী কার প্রাপ্য, বড় দুই ভাই-এর না ছোট ভাই-এর? ছোটর আনা হারটা শুধুমাত্র অপূর্ব নয়, অনবদ্যও। এরকম সুন্দর হার আমরা কেন পৃথিবীতেও কেউ দেখেছে কিনা সন্দেহ। তাই ছোট ছেলেই জমিদারী পাবার যোগ্য।"
জমিদারের এই কথাকে বড় বা মেজ ছেলের অস্বীকার করার উপায় ছিল না। সত্যিই, ছোটর আনা গজমতীর হারটার স্নিগ্ধতায় ঘরটা ভরে আছে। আর সবচেয়ে সুন্দর হার যে আনতে পারবে সেই জমিদারী পাবে এটাও ঠিক, তবুও বড় আর

মেজো হিংসেয় জ্বলে যেতে লাগল এই ভেবে যে ছোট হয়েও সে কেন জমিদারীটাও পেয়ে যাবে।
তাই রাগে হিংসেয় বড় দুই ভাই বল্ল—
"নাঃ, সুন্দর হার আনলেও ছোট কিছুতেই জমিদারী পাবে না। আমরা বড়, জমিদারী পাওয়াটা উচিত আমাদের মধ্যে কোনও একজনের।"
হিংসুক দুই দাদার এই কথা শুনে ছোট ভাই একটুও অবাক হোল না। বৃদ্ধ জমিদার তার বড় দুই ছেলে কতটা যে লোভী এবার পুরোপুরি বুঝতে পারলেন। তিনি এবার কিছু বলবার আগে ভালমানুষ ছোট ছেলে বল্ল—
"দেখো, এই জমিদারী আমি যদি না পাই তো নাই পেলাম। ন্যায়তঃ এই জমিদারী এখন আমারই পাওয়া উচিত কেননা আমিই সবচেয়ে সেরা হারটা আনতে পেরেছি। তবুও দাদারা দুজনে যখন চাইছে তখন জমিদারী তারাই নিক আমাকে শুধু ঐ বুড়ো ঘোড়া "বাদামীকে" আর তার কাঠের গাড়িটা দাও তাহলেই হবে। ভাগ্য যদি সহায় হয় তবে শেষে জিৎ আমারই হবে।"
ছোট ছেলের এই উদারতা দেখে বৃদ্ধ জমিদার খুব খুশী হলেন আবার দুঃখও পেলেন। দুঃখ পেলেন এই ভেবে যে জমিদারীটা বড় বা মেজ দুজনের কারুর হাতে চলে যাচ্ছে বলে। কেননা প্রজারা বড় দুভাইকে একটুও পছন্দ করে না। কিন্তু ছোট ছেলে যখন জমিদারীটা দাদাদের ছেড়ে দিল তিনি আর কি করেন, চুপ করেই থাকলেন। ভাবলেন এতে যদি ভাইদের মধ্যে শান্তি আসে তবে তাই হোক।
বড় দুই ভাই ছোট ভাইকে বাদামী আর তার গাড়ীটা দিতে একটুও আপত্তি করল না। কিন্তু জমিদারী নিয়ে নিজেদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া সমানেই চালাতে লাগল।

বড় ভাই বলে—"আমি বড়, এই জমিদারী, প্রাসাদ সব আমার পাওয়া উচিত।"

মেজ ভাই বলে—"নাঃ, কিছুতেই না। এ সবই আমি পাব। আমি তোর চেয়ে বিদ্বান বেশী। তাই জমিদারী আমিই চালাতে পারি, তুই পারবি না।"

রাজা বড় দুই ছেলের ঝগড়া দেখে প্রথমে চুপ করে থাকলেন, ভাবলেন তারা নিজেদের মধ্যে আপোষে সবকিছু মিটিয়ে ফেলবে। কিন্তু শেষে যখন বড় দুই ছেলের ঝগড়া বাড়তে বাড়তে প্রায় লড়াই-এ দাঁড়িয়ে যেতে লাগল তখন আর উপায় না দেখে জমিদার আবার ছেলেদের ডেকে পাঠালেন, বল্লেন,—"দেখ, ছোট ভাই-এর মত উদার মন তোমাদের নয়, তাই তোমরা বড়-দুইজনে মিটমাট করে কিছু ঠিক করতে পারছ না। তাই ন্যায়ত ছোট ভাই জমিদারী পাওয়ার যোগ্য হলেও, সে যখন এটা ছেড়ে দিয়েছে তোমাদের দুজনকে, আর তোমরাও কে নেবে ঠিক করতে পারনি তখন নূতন করে ফয়সলা আমাকেই করতে হবে। কেননা তোমাদের ঝগড়াও আমি আর বাড়তে দেব না। এইবার শেষবারের মত সুযোগ দিচ্ছি তোমাদের। তোমাদের তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী বৌ যে আনতে পারবে সেই পাবে এই জমিদারী। এবারও সময় দিচ্ছি মাত্র একমাস। কিন্তু মনে রেখো এইবার শেষবার। এরপরও যারা হেরে গিয়েও ঝগড়াঝাটি করবে তাদের আমি এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব। এই আমার শেষ কথা।"

বাবার এই কথা শুনে বড় আর মেজ ছেলের মুখে হাঁসি ফুটল। ঝগড়া বন্ধ হোল। দুজনেই মনে মনে ভাবতে লাগল সবচেয়ে সেরা সুন্দরী সেই আনতে পারবে কেননা দেখতে সেই সবচেয়ে সুন্দর। আর তারপর জমিদারী আর সবকিছু সেই পেয়ে যাবে। সবচেয়ে সেরা সুন্দরী-বৌ আনবার জন্য বড় আর মেজো সবচেয়ে

তেজী আর দামী ঘোড়া নিয়ে রওনা হোল। সংগে নিল প্রচুর টাকা-পয়সা, সোনা-রূপো, হীরে জহরৎ। কনেকে আনতে এসবতো লাগবেই।

আগের মত বড় ভাই জমিদার বাড়ীর উত্তর দিকের ফটক দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে রাজ্যের উত্তর দিকে চলে গেল। আর মেজো ভাই গেলো দক্ষিণ দিকে, প্রাসাদের দক্ষিণ দিকের ফটক দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে। ছু-ভাই তো ছুদিকে গেল, কিন্তু ভালমানুষ, ঠাণ্ডা-শান্ত ছোট ছেলে একচুলও নড়াচড়া করল না। সে বৃদ্ধ জমিদারের কাছেই রয়ে গেল।

বৃদ্ধ জমিদার এই দেখে আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি ছোট ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন,—

"কিরে তুই কি একবার শেষবারের মত চেষ্টা করবি না? সেরা সুন্দরী কনে, চেষ্টা করলে হয়ত তুইও আনতে পারিস্।"

ছোটছেলে মিষ্টি হেসে বল্ল—"তুমি তো জানই বাবা, সেরা সুন্দরী কনে খোঁজবার জন্য ছুই-দাদা সমস্ত রাজ্য তোলপাড় করছে। রাজ্যের ভিতরে-বাইরে সব জায়গাইতো তারা খুঁজবে। ফলে আমার খুঁজতে যাওয়ার জন্য কোন জায়গাই পড়ে থাকবে না। তার চেয়ে এই কয়দিন আমি তোমার কাছেই থাকি। এই কয়দিন শুধু একলাই তোমার ভালবাসা আদায় করি। সেটাই তো আমার সবচেয়ে বড় লাভ।"

ছোট ছেলের এই কথা বৃদ্ধ জমিদারের ভাল লাগলেও তিনি চুপ করে থাকলেন। আগের ছুইবার ছোট-ছেলেরই জয় হয়েছিল। তাই তিনি ভাবলেন দেখা যাক্, এবার ছোট ছেলে কি করে।

এরপর ধীরে ধীরে দিন কেটে যায়। একমাস শেষ হতে তখন আর চারদিন বাকী। বড় ছুই ভাই-এর ফেরবার সময়ও প্রায় হয়ে এসেছে। তখন ছোট ছেলে বাবাকে বল্ল—"কি বল বাবা, দাদাদের খোঁজা এতদিনে নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে। এবার আমি

খুঁজতে বেরুলে দাদারা বোধ হয় আর রাগ করবে না। দেখি এবার চেষ্টা করে, সুন্দর কনে আমিও জোগাড় করতে পারি কিনা। ভাগ্য সহায় হোলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। আর বাবা তুমি যদি আশীর্বাদ কর, তবে ভাগ্য আমার সহায় হবেই।"

নির্লোভী, সৎ, দয়ালু ছোট ছেলেকে বৃদ্ধ জমিদার বারবার আশীর্বাদ করলেন। তারপর ছোট ছেলে আস্তাবল থেকে বুড়ো ঘোড়া বাদামীকে বের করে এনে তাকে আদর করল। তাকে জীন পড়ালো আর কাঠের গাড়ীটাও তার সংগে জুড়ে দিল। এরপর জমিদার বাড়ীর পূব দিকের ফটক দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে রাজ্যের পূব-দিকে চলতে স্বরু করল।

ছোট ছেলে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে ভাবতে লাগল এবার কোনদিকে, কোথায় যাবে। বেড়ালেরা প্রথমবার তাকে সুন্দর অপূর্ব রুমাল দিয়েছিল। দ্বিতীয়বার দিয়েছিল অপূর্ব সুন্দর গজমতির হার। কিন্তু সুন্দর বিয়ের কনে বেড়ালরা পাবে কোথা থেকে? যাই হোক, ছোট ছেলে ভাবল বুড়ো বাদামী দুবারই তাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল, দেখা যাক এবার কি করে —এই ভেবে ছোট ছেলে বুড়ো বাদামীর হাতে আগের দুবারের মত এবারও নিজেকে ছেড়ে দিল।

ঘোড়ার লাগাম আলগা করা মাত্রই বুড়ো বাদামী উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে স্বরু করল। রাজ্যের সীমানা ছেড়ে জংগলের ভিতরের সরু রাস্তা ধরে ঝড়ের গতিতে বাদামী ছুটতে লাগল জোরে, আর তারপর ছোট ছেলেকে নিয়ে এসে হাজির হোল বেড়ালদের ঐ রাজপ্রাসাদের সামনে। প্রাসাদের সামনে পৌঁছে ফটকের মুখে ঠিক আগের বারের মতই বাদামী-ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়ল। সে সময় অন্য বারের মতই দুটো বড় বড় বনবেড়াল প্রাসাদের ফটকের সামনে বসে দাঁত বার করে ভয় দেখাচ্ছিল। রাগে বনবন করে ঘুরছিল তাদের চোখ দুটো।

ছোট ছেলে প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে বল্ল—"ওঃ, বন্ধু বাদামী এবারও বেড়ালদের প্রাসাদে নিয়ে এসেছে। ঠিক আছে, ভাগ্যে যা আছে তা হবেই। আর বেড়ালেরা তো আমার উপকারই করেছে। তাই দেখাই যাক না কি হয়।" —এই সব ভেবে ছোট ছেলে আগের মতই বেড়ালদের প্রাসাদে ঢুকে পড়ল।

বেড়ালরা এবার ছোট ছেলেকে দেখে আরও বেশী খুশি হলো। প্রাসাদের ভিতরের বাগানে আসার সংগে সংগেই আগের মতই বড়-ছোট, সাদা কালো অসংখ্য বেড়াল তাকে ঘিরে ধরল। সবাই আনন্দে লাফালাফি সুরু করল। সবাই মিলে রাজার মত সমাদরে তাকে প্রাসাদের ভিতরে নিয়ে গেল। বুড়ো বাদামীকেও যত্ন করে নিয়ে গেল আস্তাবলে, আর ঘোড়াকে খেতে দিল ভাল-দামী ছোলা, কচি ঘাস।

খাওয়া দাওয়ার পর গভীর রাত্রে ছোট ছেলে বেড়ালদের প্রাসাদের সব জায়গা ঘুরতে লাগল, খুঁজতে লাগল কোথাও কোন মানুষ দেখতে পাওয়া যায় কিনা। নাঃ, সব জায়গা ঘুরেও বেড়াল ছাড়া একটা মানুষও তার চোখে পড়ল না। শেষে হতাশ হয়ে ছোট ছেলে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল হোলে ছেলেটা বেড়ালদের সেই প্রাসাদ থেকে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে সুরু করল তাই দেখে সমস্ত বেড়ালরা তাকে ঘিরে ধরে বল্ল—

"ছোট ছেলে, তুমি কেন চলে যেতে চাইছ? এবার অন্য বারের চেয়েও বেশী চিন্তিত কেন?" —এই বলে সমস্ত বেড়ালেরা তাকে বার বার অনুরোধ করতে লাগল তাদের সংগে থেকে যাওয়ার জন্য। বেড়ালেরা আবার বল্ল যে এবার যদি ছেলেটা তাদের সংগে থেকে যায় তবে এরপর আর কোন অনুরোধ তারা করবে না। এই বলে কাতর ভাবে ছেলেটার দিকে

তাকিয়ে থাকল।

বেড়ালদের এই অনুরোধে ভালমানুষ ছোট ছেলে বল্ল—
"দেখ বেড়াল ভাই-বোনেরা, তোমাদের এখানে থেকে যেতে আমার একটুও আপত্তি নেই। তোমরা সবাই কত আদর যত্ন করেছ, সে কথা কি আমি ভূলতে পারি। কিন্তু কি করব, আমার হাতে যে আর মাত্র তিনদিন সময় আছে। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর সব চেয়ে সেরা সুন্দরী কনেকে যদি নিয়ে যেতে পারি তবেই বাবার জমিদারিটা আমি পাব। তা না হলে দাদাদের মধ্যে কেউ একজন সেটা পাবে।" —এই বলে কনের ঘটনাটা বেড়ালদের খুলে বল্ল।

সব শুনে ওদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দেখতে ধবধবে সাদা বেড়ালটা বলে উঠল,—
"ওঃ, এই কথা, এতো খুবই সোজা ব্যাপার। তুমি আমাদের সংগে আরও তিনদিন থাক। তারপর সবচেয়ে সুন্দরী কনেকে সংগে করে বাড়ী ফিরে যেও। আর তার সংগে দামী দামী যৌতুকও নিয়ে যেও। আমরাই সব ব্যবস্থা করে দেব। তোমার কোন চিন্তাই নেই। তুমি নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে তিনদিন থেকে যাও।"

সাদা বেড়ালটার এই কথা শুনে ছোট ছেলে খুশী মনেই বেড়ালদের সংগে ওদের প্রসাদে তিনদিনের জন্য থেকে গেল। বেড়ালেরা এত খাতির যত্ন করতে লাগল যে তার কোন তুলনাই নেই। তারা ছেলেটার ঘোড়া বাদামীকেও আদর যত্ন করতে ভুল্ল না। বেড়ালের প্রাসাদে হাজার হাজার সাদা কালো, ছোট বড় বেড়ালদের সংগে হৈ-চৈ আনন্দ করেই ছোট ছেলের তিন দিন কেটে গেল। এই তিনদিন ঐ সাদা সুন্দর বেড়ালটাও সব সময়েই ছোট ছেলেটার সংগে সংগে থাকল। এমনকি ছেলেটা ঘুমলেও তার পায়ের কাছে বসে থাকল।

তারপর তৃতীয় দিন সন্ধ্যে বেলায় যখন ছোটকুমারের বাড়ী যাওয়ার সময় হোল, তখন সমস্ত বেড়ালরা আবার তাকে ঘিরে ধরল, বল্ল—

"লক্ষ্মী ছোট ছেলে, এ রাতটা তুমি আমাদের সংগে থেকে যাও। এত রাতে সুন্দরী কনেকে নিয়ে জংগলের মধ্যে দিয়ে যাবে কি করে? তার চেয়ে রাতটা থেকেই যাও। সকালেই তোমার সুন্দরী কনেকে নিয়ে বাড়ী ফির।"

ছোট ছেলে অবাক হোয়ে বেড়ালদের জিজ্ঞেস করল—

"কনেই দেখছি না, তা আবার সুন্দরী কনে। এবার বুঝতে পারছি আমাকে একলাই বাড়ী ফিরতে হবে।"

তখন সাদা সুন্দর বেড়ালটা বল্ল—

"কেন ভাবছ তুমি? নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে যাও। আমরা সবাই বলছি, সকালেই তোমার সুন্দরী কনেকে তুমি পেয়ে যাবে।"

হাতে যখন আর একটা দিন সময় আছে তখন ছোট ছেলে বেড়ালদের এই অনুরোধে সে রাত্রেও বেড়ালদের প্রাসাদে থেকে যেতে রাজী হোল।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর ছেলেটা বিছানায় শুতে গেছে। কিন্তু মাঝ রাতে প্রচণ্ড ঝড়ের গর্জনে তার ঘুম ভেঙে গেল। তারপর গর্জন আর বিদ্যুতের চমক সমানেই বেড়ে যেতে লাগল। সেই সময় মনে হোতে লাগল যেন প্রচণ্ড ভূমিকম্প সুরু হয়েছে। বেড়ালদের প্রাসাদের দরজা-জানলাগুলো সেই ঝড়ের ধাক্কায় একবার খুলছে আর একবার বন্ধ হচ্ছে। এই শব্দে, বিদ্যুৎ চমকে, ঝড়ের কাঁপনে ছেলেটা ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর ছেলেটা সাহস করে উঠে দাঁড়াল। আর সমস্ত বেড়ালদের খুঁজে বেড়াতে লাগল যদি ওদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যায়।

কিন্তু কি আশ্চর্য! বেড়ালদের একজনকেও দেখতে পাওয়া গেল না। তার বদলে দেখা গেল অসংখ্য ছেলে-মেয়ে, লোকজন, দাস-দাসীতে সেই বেড়ালদের রাজপ্রাসাদ ভর্ত্তি হয়ে গেছে। আর এক অপূর্ব সুন্দর রাজকন্যা সিংহাসনে বসে আছে। সেই রাজকন্যার অপূর্ব রূপে সমস্ত ঘর আলো হয়ে আছে। মনে হচ্ছে ত্রিভুবনের মধ্যে এরচেয়ে সুন্দরী রাজকন্যা বোধ হয় আর কোথাও নেই।

ছেলেকে দেখে রাজকন্যা সিংহাসন থেকে উঠে এসে তার হাত দুটো ধরে তাকে নিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে বল্ল—
"আমায় চিনতে পারছ? আমিই সেই সুন্দর সাদা বেড়াল। আর এখন আমিই তোমার কনে। তুমি এবার তোমার জমিদারীতে আমায় নিয়ে চল।"

ছেলেটা এবার বুঝতে পারল বেড়ালদের প্রাসাদের সব বেড়ালরা এখন মানুষ হয়ে গেছে। এইসব দেখে তারও তখন আনন্দের সীমা থাকল না।

এর পর রাজকন্যা দশটা সাদা ঘোড়াকে জীন পরালো। তাদের দুই সারীতে সাজাল, আর সবার আগে রাখাল ছেলেটার ঘোড়া 'বাদামীকে'। সবার পেছনে বাদামীর কাঠের গাড়ীটাকে আটকে দিল। এসব দেখে মনে হতে লাগল যেন স্বর্গ থেকে দেবতারা সোনার রথ পাঠিয়েছেন রাজকন্যা আর ছোট ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারপর এগারোটা ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে চড়ে বসল রাজকন্যা আর ছেলেটা এগারো ঘোড়ার লাগামে টান দিল। সঙ্গে সঙ্গেই পক্ষীরাজের মত প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে লাগল। গাছপালা পথের সামনে যা পড়তে লাগল ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে চলার পথ পরিষ্কার হয়ে যেতে লাগল। তারপর ঘূর্ণিঝড়ের মত ধূলো উড়িয়ে জমিদার প্রাসাদের সামনে ছেলেটার গাড়ী এসে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে কনে নিয়ে বড় দুই ভাই জমিদার প্রাসাদে এসে পৌঁছেচে। কনে দুজনে সুন্দরী হলেও অপূর্ব নয়। সবাই তখন ছোটছেলের জন্য অপেক্ষা করছিল।

এই সময় প্রচণ্ড শব্দে জমিদার, বড় ও মেজ ছেলে, তাদের কনেরা সবাই প্রাসাদের বাইরে এলো। এসে দেখে সে কি অপূর্ব দৃশ্য।

এগারোটা ঘোড়ায় টানা গাড়ী থেকে নামছে ছোট ছেলের কনে। তার দুধে-আলতা রঙ, দীঘল টানা টানা চোখ, কি স্নিগ্ধ-রূপ লাবণ্য, মাথায় ঝক্‌মক্ করছে নবরত্নের মুকুট। আর কনের শরীর জুড়ে আছে সোনার সূতোয় বোনা শাড়ী। শাড়ীর পাড়ে ফুটে আছে হীরে-মোতির ফুল।

রাজকন্যার রূপ দেখে, তার ঐশ্বর্য দেখে, বড় আর মেজভাই লজ্জায় মাথা নীচু করে থাকল। আর তাদের কনেরা লজ্জায় প্রাসাদের মধ্যে পালিয়ে গেল।

রাজকন্যাকে দেখে জমিদার, তার প্রাসাদের সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। তখন জমিদার বলে উঠলেন,—

"ছোট ছেলেই সবচেয়ে সুন্দরী কনেকে আনতে পেরেছে। তাই জমিদারী, প্রাসাদ, এইসব সেই পাবে আর হিংসুটে বড় দুই ছেলে রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে।"

এই শুনে ছোট ছেলে বল্ল—

"না, না, সে কিছুতেই হবে না। এই জমিদারী বরং দুই দাদা ভাগ করে নিক্। আমাকে শুধু ঐ বাদামী বুড়ো ঘোড়া আর কাঠের গাড়ীটা দাও। আমি তাতেই খুশী। আমি রাজকন্যার রাজ্যেই ফিরে যাব, কেননা সে রাজ্য চালাবার জন্য আমি ছাড়া আর কেউ নেই। কিন্তু বুড়ো 'বাদামী' আর কাঠের গাড়ীটা সঙ্গে নিয়ে যাব।"

ছোট ভাই-এর এই মহত্ত্ব দেখে বড় দুই ভাই-এর এবার সত্যিই

অনুশোচনা হোল। তারা এবার বুঝতে পারল তারা কত লোভী ছিল। তাই বড় আর মেজো তুই ভাই-এর ঝগড়া এবার বন্ধ হোল। তারা বাবাকে বল্ল—

"বাবা, তুমি যা বলবে তাই-ই হবে। তুমি যদি বল, ছোট যা বলেছে সেইমত আমাদের চলতে আমরা তাই মেনে নেব। আর রাজ্য ছেড়ে যেতে বল্লে তাও মেনে নেব।"

জমিদার এবার সত্যিই খুশী হলেন। বড় আর মেজো ছেলেকে জমিদারী ভাগ করে দিয়ে তিনি ছোট ছেলের সংগে বিড়ালদের রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন। বেড়ালদের প্রাসাদে রাজকন্যার সংগে এবার ছোট ছেলের বিয়ে হেলে খুব ধূমধাম করে।

বিয়ের পর ছোট তার কনে রাজকন্যাকে জিজ্ঞেস করল—তারা সবাই আবার মানুষ হয়ে গেল কি করে ?

তখন রাজকন্যা বলল—"এই রাজ্য ছিল তার বাবা সুমেরু রাজার। তিনি ছিলেন খুব দয়ালু রাজা। প্রজারা তাকে খুব ভালবাসত। একদিন রাক্ষসরাজ এসে সুমেরুরাজকে বল্ল যে সে আমাকে বিয়ে করবে। রাজা এতে রাজী হলেন না। তখন রাক্ষসরাজ আক্রমণ করে বাবাকে মেরে ফেল্ল। তারপর আমাকে, রাজ্যের সবাইকে বেড়াল করে দিল। রাক্ষস রাজা চলে যাওয়ার সময় বল্ল যদি কোনও দয়ালু মানুষ এখানে তিনবার আসে, বেড়ালদের সংগে এই প্রাসাদে খুশী মনে রাত কাটিয়ে যায়, আর অন্ততঃ একবার একসংগে তিনরাত্রি বেড়ালদের সংগে থাকে, তবেই আমরা আবার মানুষ হয়ে যাব। জমিদারের ছোট ছেলে সত্যিই ছিল দয়ালু আর সৎ আর সে সত্যিই তিনবার তাদের প্রাসাদে এসে তিনবার তাদের সংগে ছিল আর শেষবারের সময় একসংগে তিনরাত তাদের সংগে কাটিয়েছে। তাই তারা বেড়াল জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছে। এইজন্যই এ রাজ্যের সবাই ছোট ছেলেটাকে এত ভালবাসে। তাকেই রাজা করতে চায়।"

বিয়ের পর রাজকন্যার সংগে ছোট ছেলে সুখে দিন কাটাতে লাগল। বুড়ো "বাদামী" ঘোড়াও ছিল সে রাজ্যের সবার প্রিয়, কেননা বাদামী-ইতো তিনবার ছোট ছেলেকে বেড়াল-দের প্রাসাদে নিয়ে এসেছিল।

জংগলের শেষে যে আনন্দের রাজ্য আছে সেখানেই কিন্তু বেড়ালদের রাজপ্রাসাদ। সেখানকার সবাই খুব ভাল, যাবে না কি তোমরা সেখানে একবার?

দেখলেতো, সৎ লোককেই ভাগ্য সাহায্য করে।

বড়-রাজকুমার বল্ল—"সোনার বুলবুলি তুমি ঘুমোতে যাও।"

সোনার বুলবুলি

সে ছিল এক বিরাট রাজ্য। তার নাম বৈশাল। সেই বৈশাল দেশের রাজার তিন ছেলে। রাজপুত্ররা সবাই ছিল সাহসী আর সর্বগুণ সম্পন্ন। বৈশাল দেশের সেই রাজপুত্ররা একদিন শুনতে পেল পাতালপুরের রাজার কথা। পাতালপুরের রাজার কাছে আছে নাকি এক সোনার বুলবুলি বুলবুলির গা যেমন সোনায় মোড়া ঝক্‌মকে, সে গানও করে অপূর্ব। আর সবচেয়ে মজার কথা—এই বুলবুলিকে যা বলা যায় সে ঠিক তাই করতে পারে। এমনকি তার কাছে যে জিনিষ চাওয়া যায় তাও এনে দিতে পারে, তা সে সম্ভবই হোক আর অসম্ভবই হোক না কেন। সেই সোনার বুলবুলির জন্য ছিল হীরে-মোতি বসানো আর সোনার তার দিয়ে বোনা এক অপূর্ব সুন্দর খাঁচা। খাঁচাটা পাতালপুরের রাজার বাগানের সোনার চাঁপা-গাছগুলোর মধ্যে সবচেয়ে যে সুন্দর গাছটা তারই ডালে ঝুলত। খাঁচার দরজা কখনও বন্ধ থাকত না। সোনার বুলবুলি সকাল বেলায় হীরে-মোতি বসানো সোনার খাঁচা ছেড়ে দূর দেশে উড়ে যেত। দেশ-বিদেশের খবর নিয়ে সন্ধ্যে বেলায় ফিরে আসত নিজের খাঁচায়। রাজা সোনার বুলবুলির কাছ থেকে দেশ-বিদেশের সমস্ত খবরই পেত। এ ছাড়াও যখন যা দরকার হোত তাও পেত। তাই এই সোনার বুলবুলির জন্যই পাতালপুরের রাজার খুব সুখে আর আনন্দেই দিন কেটে যেত।

এই সোনার বুলবুলির বাঁ-পায়ের মধ্যে ছিল একটা সোনার আংটি। এই সোনার আংটি যে খুলে নিজের কাছে রাখতে পারত, বুলবুলিটা তখন তার হয়ে যেত, তার কথামত সব কাজ করত। সকালবেলায় রাজা বুলবুলিটার পায়ে এই সোনার আংটি পরিয়ে দিত, আর সন্ধ্যেবেলায় বুলবুলি তার খাঁচায় ফিরে এলে আংটিটা খুলে নিজের কাছে রেখে দিত। এইজন্যই সোনার বুলবুলি শুধুমাত্র পাতালপুরের রাজার কথাই শুনত। আর এই সোনার বুলবুলির জন্যে সবাই পাতালপুরের রাজাকে খুব ভয় পেত।

সোনার বুলবুলির অদ্ভুত ক্ষমতা শুনে কত দেশের রাজপুত্ররা যে এই বুলবুলিকে পাবার জন্য পাতালপুরে আসত তার আর হিসেব নেই। তারা কিন্তু কেউই বুলবুলিকে নিয়ে যেতে পারত না, বরং তারা সবাই পাতালপুরে এসে আর ফিরতেই পারত না। কত রাজপুত্র এইরকম ভাবে পাতালপুরে এসে হারিয়ে যেত তার হিসেব মেলা মুস্কিল।

বৈশাল দেশের তিন সাহসী রাজপুত্ররা যখন এই সোনার বুলবুলির কথা শুনল, তখন আর তারা চুপ করে থাকে কি করে? তারা এও জানত অনেক রাজপুত্রই বুলবুলিকে আনতে গিয়ে পাতাল রাজার দেশ থেকে ফিরে আসতে পারেনি। তাতেও কিন্তু রাজপুত্ররা ভয় পেল না। বরং বড়, মেজ আর ছোট রাজপুত্র পরামর্শ করে ঠিক করল শুধুমাত্র চুপচাপ বসে থেকে তো কোন লাভ নেই। তার চেয়ে বরং চেষ্টাই করা যাক্ না। তারা ভাবল চেষ্টা করলে হয়ত অসম্ভবও সম্ভব হোতে পারে।

প্রথমে ঠিক হোল বড়-রাজপুত্র যাবে পাতালপুরের রাজার কাছে। ঘোড়ার পিঠে জীন পড়িয়ে বড়-রাজপুত্র বৈশাল দেশ থেকে রওনা হোল। মেজ আর ছোট রাজপুত্র রাজ্যের

সীমানা পর্যন্ত এল বড় রাজপুত্রকে বিদায় জানাতে। রাজ্যের সীমানায় এক বিরাট লোহার সেতু ছিল। বড় রাজপুত্র সেইখানে এসে ঘোড়া থেকে নামল। তারপর তলোয়ার দিয়ে তিনটে দাগ কাটল সেতুর লোহার গায়ে।
এরপর বড় রাজপুত্র বল্ল—"তোমরা ছু-ভাই প্রত্যেকদিন এখানে এসে এই দাগ তিনটের দিকে নজর রেখো। যতদিন পর্যন্ত এই দাগ তিনটে ঠিক এইরকমই থাকবে বুঝবে আমার কোনও বিপদ হয় নি। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে দেখবে লোহার গায়ের এই দাগ তিনটে লাল হয়ে গেছে বুঝবে আমি বিপদে পড়েছি। তখন আমাকে উদ্ধারের জন্য মেজো রাজপুত্র রওনা হয়ে যেও।"
মেজো আর ছোট রাজপুত্র দাদার কথা মন দিয়ে শুনল। বিপদের সম্ভাবনা থাকা সত্বেও কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে বড় রাজপুত্র বৈশাল রাজ্যের সীমানা ছেড়ে পাতালপুরের রাজ্যের দিকে রওনা হয়ে গেল।
চলতে চলতে এক সপ্তাহ পরে বৈশাল দেশের বড় রাজপুত্র পাতালপুরের রাজ্যে এসে পৌঁছাল। বড় রাজপুত্র তারপর এসে হাজির হোল রাজসভায়—রাজার কাছে।
বড় রাজপুত্রকে দেখে রাজা জিজ্ঞেস করল—
"কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ? কি চাই তোমার?"
বড় রাজপুত্র কোথা থেকে এসেছে, কে সে, সব কিছুই রাজাকে বল্ল। সবশেষে একথাও বল্ল যে সোনার বুলবুলিটা নিয়ে যাবার জন্যই সে এখানে এসেছে।
একথা শুনে পাতালপুরের রাজা বল্ল—"রাজপুত্র, এই সোনার বুলবুলিকে এ রাজ্য থেকে তুমি নিয়ে যেতে পারবে না। কত দেশের কত রাজপুত্র একে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কেউই তা পারে নি। কারণ কি জান? এই সোনার বুলবুলির এক অদ্ভুত যাছশক্তি আছে। এতো সামান্য সোনার বুলবুলি

নয়। তাই হাজার চেষ্টা করেও কেউ এ রাজ্য থেকে বুলবুলিকে নিয়ে যেতে পারে নি। আর তুমিও পারবে না।"

বড় রাজপুত্র সবশুনেও আবার বল্ল—"রাজা আপনার যখন বুলবুলি হারাবার কোন ভয়ই নেই তখন আমাকে একবার চেষ্টা করতে দিন। আপনি যে আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা, সোনার ঐ বুলবুলি ছাড়া আমি দেশে ফিরব না। তাই আপনার বাগানে যাওয়ার অনুমতি দিন, যাতে হীরে-মোতি বসানো সোনার খাঁচা থেকে বুলবুলিকে আনবার চেষ্টাটা আমি করতে পারি।"

পাতালপুরের রাজা তখন আর কি করবেন। তাকে অনুমতি দিতেই হোল।

বড় রাজপুত্র অনুমতি নিয়ে রাজার বাগানে এল। সে এক মস্ত বড় বাগান। তখন সবে সূর্য্য অস্ত গেছে। বড় রাজপুত্র সেই গোধূলি আলোয় সোনার চাঁপা গাছগুলোর ডালে হীরে মোতি বসানো সোনার খাঁচাটা খুঁজতে লাগল। কিন্তু এগাছ ও গাছ যাই-ই খোঁজে না কেন, কোথাও হীরে-মোতির সোনার খাঁচাটা দেখতে পেল না। খুঁজতে খুঁজতে, শেষকালে বাগানের অনেক—অনেক ভিতরে চলে এল রাজপুত্র, একেবারে ঘন পাইন গাছের দীর্ঘ সারির মধ্যে। তারপর তারও মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ল সোনার চাঁপা গাছ। সোনার চাঁপাগাছে ফুটে আছে সোনার চাঁপাফুল। চারদিক সেই সোনার আলোয় আলো হয়ে আছে। আর ঠিক তারই মধ্যেকার সোনার চাঁপাগাছের ডালে ঝুলছে হীরে-মোতির কাজ করা অপূর্ব সুন্দর সোনার খাঁচা। মানুষের মত লম্বা লম্বা শরবন এই সোনার চাঁপা বনের মাটি ছেয়ে আছে। সে সময় খাঁচাটা শূন্য।

সোনার বুলবুলি তখনও খাঁচায় ফিরে আসেনি। খালি

সোনার খাঁচা শুধু ঝিকমিক্ করছে।

এই দেখে রাজপুত্র সোনার খাঁচার নীচে, শরবনের মধ্যে লুকিয়ে থাকল। আর সময় গুণতে লাগল কখন সোনার বুলবুলি ফিরে আসে তার খাঁচাতে।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দে সময় কেটে যেতে লাগল। রাত বাড়তে লাগল। হঠাৎ এক সময় মনে হোল বাগানের সেই নিস্তব্ধতা কেটে গেল। মনে হোল বাগানের মধ্যে যেন অসংখ্য পাখী অপূর্ব মিষ্টি সুরে গান গাইছে। সোনার চাঁপা গাছগুলো যেন আনন্দে দোলা খাচ্ছে। ঠিক তার পরে সোনার বুলবুলি উড়ে এসে খাঁচায় বসল।

সোনার খাঁচায় বসবার পর সোনার বুলবুলি চারদিক ভাল করে দেখল! তারপর করুণ সুরে বল্ল—

"এ রাজ্যের সবাই এখন ঘুমোতে গেছে। এখানে কি এমন একজনও নেই যে আমায় আদর করে বলে—সোনার বুলবুলি তোমার চোখে ঘুম নেই কেন? তুমি ঘুমোতে যাও।"

বুলবুলির করুণ ডাক শুনে বৈশাল দেশের বড় রাজকুমারের খুব কষ্ট হোল। সে মনে-মনে ভাবল, সোনার বুলবুলি যদি শুধু এইটুকু শুনলে খুশী হয় তবে ক্ষতি কি। বরং, বুলবুলি খুশী হোলে ওকে নিজের রাজ্যে সহজেই নিয়ে যাওয়া যাবে।

এই ভেবে বড়-রাজকুমার বলে উঠল—

"সোনার বুলবুলি, তোমার চোখে ঘুম নেই কেন? সোনার লক্ষ্মী বুলবুলি, তুমি ঘুমোতে যাও।"

বড় রাজকুমারের কথা শেষ হওয়া মাত্র সোনার বুলবুলি খাঁচা থেকে উড়ে এল। চোখের পলকে বড়-রাজকুমারের মাথায় তার ধারালো ঠোঁট দিয়ে তিনবার আঘাত করল। আর সঙ্গে সংগেই, অদ্ভুতভাবে বড় রাজপুত্র সোনার চাঁপাবনের মধ্যে একটা সোনার চাঁপা গাছ হয়ে গেল।

এদিকে সাতদিন পার হয়ে যাওয়ার পর আটদিনের দিন বৈশাল দেশের মেজ আর ছোট রাজপুত্র তাদের রাজ্যের সীমানায়, সেই লোহার সেতুটার কাছে এল। তারা অন্যদিনের মত লোহার সেতুটার গায়ে দাগটার দিকে তাকাতেই চম্‌কে উঠল। লোহার গায়ের দাগ তিনটে সেদিন লাল হয়ে গেছে।

দুই ভাই বুঝতে পারল বড় রাজকুমারের বিপদ হয়েছে। তাই একমুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করে মেজ রাজকুমার ঘোড়া নিয়ে রওনা হোল পাতালপুরীর রাজ্যে। রওনা হওয়ার সময় মেজ রাজকুমার সেই সেতুর লোহার গায়ে আরও তিনটে দাগ কেটে ছোট রাজকুমারকে বল্ল—

"এই দাগটার দিকে নজর রেখো। যতদিন এই দাগ তিনটে ঠিক থাকবে, বুঝবে আমার কোনও বিপদ হয়নি। কিন্তু যে মুহূর্ত্ত দেখবে এই দাগ তিনটেও লাল হয়ে গেছে, বুঝবে আমিও বিপদে পড়েছি? তখন উদ্ধারের জন্য রওনা হয়ে যেও।"

মেজ রাজপুত্রতো রওনা হোল সেই দূর পাতালপুরীর দেশের দিকে। একনাগাড়ে ছয় দিন-ছয় রাত চলবার পর সাতদিনের দিন মেজ রাজপুত্র এসে পৌছাল পাতালপুরীর রাজ্যে। সেই রাজ্যে পৌছে কোনও সময় নষ্ট না করে মেজ রাজপুত্র রাজার কাছে এসে বল্ল—

"আমার দাদা বড়-রাজপুত্র এখানে এসেছিল আপনার সোনার বুলবুলি নেবার জন্য। আপনি জানেন, কোথায় আমার দাদা?"

পাতালপুরীর রাজা বল্ল—"বড় রাজপূত্র সোনার বুলবুলি আনবার জন্য আমার বাগানে গিয়েছিল। তারপরতো সে আর ফেরেনি। কোথায় আছে তাওতো জানিনা।"

দাদার খোঁজ না পেয়ে মেজ রাজকুমার তখন রাজাকে বল্ল—"আমি একবার আপনার বাগানে যেতে চাই। সেখানে খুঁজে

দেখতে চাই বড়-রাজকুমারকে পাই কিনা। তাছাড়া সোনার বুলবুলিও আনবার একটা চেষ্টা করতে পারি।"

রাজা বুঝলেন মেজ-রাজপুত্রকেও নিষেধ করে কোনও লাভ হবে না। তাই তিনি তাকে বাগানে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

মেজ রাজকুমার তখন রাজার অনুমতি পেয়ে বাগানে গেল। বাগানে গিয়ে মেজ রাজপুত্র সমস্ত বাগান খুঁজল। কিন্তু বড় রাজকুমারকে কোথাও খুঁজে পেল না। তবে খুঁজতে খুঁজতে বাগানের মধ্যে সোনার চাঁপা গাছের ঝোপ আর তারই মধ্যে হীরে-মোতির কাজ করা সোনার খাঁচাটাকে ঝুলতে দেখল।

খাঁচাটাকে দেখে মেজ রাজকুমার বুঝতে পারল সোনার বুলবুলি সন্ধ্যে হোলে এই খাঁচায় এসে বসবে। তাই সোনার বুলবুলিকে ধরবার জন্য সোনার চাঁপা গাছের নীচে, শরবণের মধ্যে মেজ-রাজকুমার লুকিয়ে পড়ল। বাগানের সমস্ত দিক তখন চুপচাপ। চারদিক তখন নিস্তব্ধ, থমথমে, অন্ধকার।

সন্ধ্যে হোয়ে অন্ধকার ছেয়ে গেল পাতালপুরীর বাগানকে। শুধুমাত্র সোনার চাঁপা-বাগানে আলো চিকমিক করছে। এই সময়ে হঠাৎ মনে হোল সমস্ত বাগান যেন পাখীর মিষ্টি গানে ভরে গেছে। বাগানে নিস্তব্ধতার কোন চিহ্নই নেই। সোনার চাঁপা গাছগুলো যেন আনন্দে দোলা খাচ্ছে। ঠিক তারপরই সুন্দর সোনার বুলবুলি উড়ে এসে বসল হীরে-মোতির কাজ করা সোনার খাঁচায়।

খাঁচায় বসবার পর সোনার বুলবুলি চারদিকে ভাল করে তাকালো। তারপর করুণ সুরে বল্ল—

"এ রাজ্যের সবাই এখন ঘুমাতে গেছে। তবুও এখানে কি এমন একজনও নেই যে এখন আমায় আদর করে বলে—সোনার বুলবুলি তোমার চোখে ঘুম নেই কেন? তুমি ঘুমাতে যাও।"

বুলবুলির করুণ ডাক শুনে মেজ রাজকুমার ঠিক তার দাদার মত

ভাবল—"আহা! বুলবুলির কত দুঃখ। তার কথা চিন্তা করবার কেউ নেই। আমি যদি ওর কথায় সাড়া দিই তবে হয়ত বুলবুলি খুশী হবে। আর তখন ওকে আমাদের রাজ্যে নিয়ে যাওয়াও খুবই সোজা হবে।"

এইসব ভেবে মেজ রাজকুমার বলে উঠল—

"সোনার বুলবুলি তোমার চোখে ঘুম নেই কেন ? সোনার লক্ষী বুলবুলি, ঘুমাতে যাও।"

মেজ রাজপুত্রের কথা শেষ হওয়ামাত্রই সোনার বুলবুলি খাঁচা থেকে উড়ে এল। চোখের পলকে মেজ রাজপুত্রের মাথায় ধারালো ঠোঁট দিয়ে তিনবার আঘাত করল। আর সংগে সংগেই মেজ রাজপুত্র সোনার চাঁপা-গাছ হয়ে চাঁপা বনের মধ্যে দুলতে লাগল।

ওদিকে মেজ-রাজপুত্র যাওয়ার পর সাতটা দিন পার হয়ে গেছে। আটদিনের সকালে বৈশাল দেশের ছোট রাজকুমার দাদার খবর জানবার জন্য রাজ্যের সীমানায়, লোহার সেতুটার কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু লোহার সেতুর তিনটে দাগের দিকে নজর পড়তেই চম্‌কে উঠল। মেজ রাজপুত্রের দেওয়া তিনটে দাগও লাল হয়ে জ্বলজ্বল করছে। ছোটকুমার বুঝল বড় রাজকুমারের মত মেজকুমারও বিপদে পড়েছে।

এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করে ছোট কুমার ঘোড়া নিয়ে রওনা হোল পাতালপুরীর রাজ্যে। সাতদিনের দিন দুপুরবেলায় পাতালপুরীতে পৌঁছিয়ে ছোট রাজকুমার ঐ দেশের রাজার সংগে দেখা করল।

ছোট রাজকুমারকে তার দুই দাদার খবর দিয়ে পাতালপুরীর রাজা বল্ল—"ছোট রাজকুমার, বুলবুলি আনতে তুমি বাগানে যও না। সোনার বুলবুলি আনতে গিয়েই তো তোমার দুই বড় আর মেজো রাজকুমার ফিরে আসেনি। সোনার

বুলবুলি আনতে যে রাজকুমারই বাগানে গেছে তারা কেউই সোনার বুলবুলি নিয়ে ফিরে আসতে পারে নি। তাই ছোট রাজকুমারের সোনার চাঁপা-বাগানে না যাওয়াই ভাল। গেলে তোমার বিপদই হবে।"

ছোট-রাজকুমার রাজাকে তার এই ভাল উপদেশের জন্য বারবার ধন্যবাদ জানাল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছোট রাজকুমার বাগানে গেল, বড় আর মেজ-রাজকুমারকে উদ্ধার করবার জন্য। আর তারই সংগে সোনার বুলবুলি আনতে।

সমস্ত বাগান খুঁজতে খুঁজতে যখন ছোটকুমার সোনার চাঁপা-গাছ দেখতে পেল তখন সহজেই সোনার বুলবুলির হীরে-মোতি বসানো সোনার খাঁচাটাও বার করতে পারল। তখনও সন্ধ্যে হয় নি। তাই ছোট রাজকুমার গাছের নীচে শরবনের মধ্যে লুকিয়ে বসে থেকে সময় গুণতে লাগল কখন সোনার বুলবুলি আসে। পাতালপুরীর রাজার বিরাট বাগান তখন চুপচাপ, নিস্তব্ধ।

সন্ধ্যে হোল। তারপর অন্ধকার নামল। একসময় হঠাৎ বাগান অসংখ্য পাখীর মিষ্টি গানে ভরে গেল। সোনার চাঁপা গাছগুলো আনন্দে দুলতে লাগল। চালাক ছোট রাজকুমার বুঝতে পারল সোনার বুলবুলির আসার সময় হয়েছে। তাই ছোট রাজকুমার তক্ষুনি শরবনের মধ্যে মরার মত নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে থাকল। সত্যিই তারপর সোনার বুলবুলি উড়তে উড়তে এসে হীরে-মোতির খাঁচার মধ্যে গিয়ে বসল। খাঁচায় বসে বুলবুলি চারদিক ভাল করে তাকাল।

তারপর অন্যদিনের মতই করুণ সুরে বুলবুলি বলে উঠল—

"এ রাজ্যে সবাই এখন ঘুমাতে গেছে। এখানে কি এমন একজনও নেই যে আমায় আদর করে বলে—সোনার বুলবুলি, তোমার চোখে ঘুম নেই কেন? তুমি ঘুমাতে যাও"

বুলবুলির এই করুণ স্বর শুনেও ছোটকুমার চুপ করে শরবনের মধ্যে শুয়েই থাকল। কোন কথাই বল্ল না।
কিছুক্ষণ পর বুলবুলি আরও করুণ সুরে বলে উঠল—
"সবাই এখন ঘুমাচ্ছে। আমিই শুধু ঘুমাতে পারছি না। সত্যিই কি এখানে এমন কেউ নেই যে এই কথাটুকু বলে আমায় সান্ত্বনা দেয়—সোনার বুলবুলি ঘুমাতে যাও"
ছোট রাজকুমার সবকিছু শুনেও কোন উত্তর করল না। চুপচাপ করে সোনার বুলবুলির খাঁচার নীচে, শরবনের মধ্যে নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে থাকল।
কিছুক্ষণ পর সোনার বুলবুলি খাঁচার দরজার কাছে এসে আরো আরোও করুণ সুরে আগেকার কথাগুলো বলে উঠল। কিন্তু তাতেও কেউ কোন উত্তর করল না দেখে সোনার বুলবুলি খাঁচার মধ্যে ফিরে গেল। শেষবারের মত ভাল করে চারদিক দেখে নিয়ে, তার ধারালো ঠোঁটটা পালকের মধ্যে ঢুকিয়ে, মাথা নীচু করে খাঁচার মধ্যে শুয়ে পড়ল।
এরপরেও ছোট রাজকুমার চঞ্চল না হয়ে চুপচাপ শরবণের মধ্যে শুয়ে থাকল। তারপর যখন বেশ কিছু সময় পার হয়ে গেল, রাতও গভীর হোল, তখন আস্তে আস্তে শরবণের ভিতর থেকে মাথা তুলল ছোট-রাজকুমার। তারপর নিঃশব্দে খাঁচার দিকে এগিয়ে গেল। খুব সাবধানে কিন্তু চোখের পলকে খাঁচার খোলা দরজা দিয়ে হাত ঢুকিয়েসোনার বুলবুলির পায়ের সোনার আংটিটা খুলে নিল। আর সংগে সংগে খাঁচার দরজাটাও বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল।
হঠাৎ এইসব ঘটনায় সোনার বুলবুলির ঘুম ভেঙ্গে গেছে। সে খাঁচার দরজাটার কাছে এসে ঠোকর মারতে লাগল। কিন্তু ছোট-রাজকুমার কোনও শব্দ না করে চুপচাপ তাকিয়ে থাকল বুলবুলির দিকে।

সোনার বুলবুলি তখন মাথা নীচু করে ছোট রাজকুমারকে বল্ল—"এখন আমার পায়ের সোনার আংটি তোমার হাতে। তাই এখন আমার সব শক্তি তোমারই হাতে। এখন তুমি যা বলবে আমি তাই করতে বাধ্য।"

তখন ছোট রাজকুমার আস্তে আস্তে বল্ল—"সোনার বুলবুলি, এ বার তাহলে বল বড় আর মেজ রাজকুমার দাদারা কোথায়?"

বুলবুলি মাথা ঘুরিয়ে বল্ল—"তোমার পাশের ঐ দুটো সোনার চাঁপা-গাছই হচ্ছে বড় রাজকুমার আর মেজ রাজকুমার।"

তখন ছোট রাজকুমার বল্ল—"সোনার বুলবুলি, তাহলে যে সমস্ত চাঁপা গাছ দেখছি সে সব কারা?"

বুলবুলি আস্তে আস্তে বল্ল—"ওরাও মানুষ। ওরা অন্য দেশের রাজকুমার। ওরাও আমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য এই বাগানে এসেছিল।"

ছোট-রাজকুমার তখন জিজ্ঞেস করল—"সোনার চাঁপা গাছ-গুলোকে কি করে আবার তাদের মানুষের চেহারায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি।"

বুলবুলি বল্ল—"তুমি শুধু তোমার দুই ভাইকে বাঁচিয়ে নাও। অন্য সব রাজপুত্রদের বাঁচিয়ে তোমার কি লাভ হবে?

ছোট রাজকুমার বল্ল—"তা হয় না। আমি সমস্ত রাজকুমার-দেরই বাঁচাতে চাই। আমি কাউকেই এ রকম রেখে ফিরে যাব না। তাতে আমার যে ক্ষতি হয় হোক।"

তখন বুলবুলি বল্ল—"ঠিক আছে রাজকুমার, তুমি যা চাও তাই-ই হবে। তুমি এখান থেকে বাগানের উত্তর দিকে যাও। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর দেখবে সবুজ রঙের বালির স্তূপ। এই সবুজ বালি এনে সোনার চাঁপা-গাছগুলোর উপর তিনবার করে ছড়িয়ে দাও। তাহলেই সবাই আবার মানুষের রূপ ফিরে পাবে। সবাই আবার আগেকার মত রাজকুমার হয়ে যাবে।"

তখন ছোট-রাজকুমার বুলবুলির কথামত সবুজ বালি এনে সামনের দুটো সোনার চাঁপা-গাছে ছড়িয়ে দিল। সংগে সংগেই সোনার চাঁপা-গাছ মিলিয়ে গিয়ে বড় আর মেজো রাজকুমার হয়ে গেল। তারপর তিন ভাই মিলে তিনবার করে সবুজ যাদু বালি ছড়াতে লাগল প্রত্যেকটা সোনার চাঁপা গাছে। আর দেখতে দেখতে সেই সোনার চাঁপা-গাছগুলোও একে একে বদলে গেল। এক একটি রাজকুমার জীবন্ত হয়ে উঠতে লাগল। ধীরে ধীরে বাগানের সমস্ত সোনার চাঁপা-গাছ এক একজন রাজপুত্রের রূপ নিল। সমস্ত বাগান সেই রাজপুত্রদের আনন্দ-কোলাহলে ভরপূর হয়ে গেল। এই দেখে আনন্দে ছোট রাজকুমারের চোখে জল এসে গেল।

এরপর রাজকুমাররা সবাই মিলেমিশে আনন্দে, হৈ-চৈ করে বাগানে থেকে গেল। ছোট রাজকুমারের আদেশে সোনার বুলবুলি সব-রাজকুমারদের থাকার জন্য একটা ছোট প্রাসাদ বানিয়ে দিল। ছোট রাজকুমারের আদেশে সোনার বুলবুলি সব রাজপুত্রদের জন্য অনেকরকম খাবার এনে দিল। সবাইকে আনন্দ দেবার জন্য সোনার বুলবুলি মিষ্টি-মিষ্টি গান গাইল। এত সব আনন্দ দেবার জন্য বৈশাল দেশের ছোট রাজকুমারকে অন্য সব রাজকুমাররা বারবার ধন্যবাদ জানাল। তার সংগে এও জানাতে ভুলল না যে তারা জীবন ফিরে পেয়েছে ছোট-রাজকুমারের জন্যই।

তিনদিন পর বড় রাজকুমার, মেজ-রাজকুমার আর সোনার বুলবুলিকে নিয়ে বৈশাল দেশের ছোট রাজকুমার রওনা হোল পাতালপুরীর রাজ্য থেকে। সোনার বুলবুলির মালিক এখন ছোট রাজকুমার। তাই পাতালপুরীর রাজাও ছোট-রাজকুমারকে কোন বাধা দিল না। অন্যান্য রাজকুমাররাও তাদের নিজের নিজের দেশে ফিরে গেল।

দাদাদের সংগে যেতে যেতে ছোট রাজকুমার এক সমুদ্রের ধারে এসে পেঁাছাল। তখন দুপুরবেলা। এই কয়দিনের পরিশ্রমে ছোট রাজকুমার খুব ক্লান্ত। তাই দাদাদের বল্ল যে সমুদ্রের ধারে একটু বিশ্রাম করে নিলে ভাল হয়। কিন্তু দাদারা বল্ল যে সেইসময় বিশ্রাম করতে গেলে বৈশাল রাজ্যে ফিরতে তাদের বহু দেরী হয়ে যাবে। তাই অপেক্ষা না করে বড় আর মেজো-রাজকুমার চলতেই লাগল। ছোট রাজকুমার কিন্তু খুব ক্লান্ত থাকায় সমুদ্রের পাড়ে শুয়ে পড়ল বিশ্রামের জন্য।

ছোট রাজকুমার সোনার বুলবুলিকে পাশে নিয়ে যেই ঘুমিয়ে পড়ল, বড় আর মেজো রাজকুমার তখন সেখানে ফিরে এল। বড় আর মেজো রাজকুমারের এই কয়দিন খুব হিংসে হচ্ছিল। সবাই ছোট রাজকুমারকে এত ভালবাসছে দেখে তারা দুভাই বুঝতে পারছিল এ সবই হচ্ছে সোনার বুলবুলির জন্য। তাই ছোট ভাইকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে বড় দুইভাই পরামর্শ করে ঠিক করল যে ঘুমন্ত ছোট রাজকুমারকে সমুদ্রে ফেলে দেবে। তারপর সোনার বুলবুলিকে নিয়ে তারাই দেশে ফিরবে।

যা ভাবল ঠিক সেই মতই কাজ করল তারা। ছোট রাজ-কুমারকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে সোনার বুলবুলিকে নিয়ে বড় আর মেজো রাজকুমার বৈশাল দেশে ফিরল। ছোট রাজকুমারের হাতে যে সোনার আংটি ছিল, যেটা ছোট রাজকুমার সোনার বুলবুলির ডান পা থেকে খুলে নিয়েছিল সেটা কিন্তু তাড়িতাড়িতে দুইভাই খুলে নিতে ভূলে গেল।

বাড়ী ফিরে বড় আর আর মেজো রাজকুমার রাজাকে বল্ল—
"জান বাবা, এই সোনার বুলবুলি আনতে গিয়ে আমাদের কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। কত বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে।"
রাজা যখন দুইভাইকে ছোট রাজকুমারের কথা জিজ্ঞেস করলেন।

তখন বড় দুই ভাই বল্ল—"আমরা তো পাতালপুরীর দেশে বহু আগে পৌঁছেছি। ছোট রাজকুমার তো পাতালপুরীর দেশে যায় নি। ওর খবর তো আমরা জানি না।"

ছোট রাজকুমার ফিরে না আসায় রাজার খুবই কষ্ট হোল। কিন্তু সেই মুহুর্তে বৈশালরাজের করবারও কিছু ছিল না।

এদিকে বুলবুলির পায়ের সোনার আংটিটা বড় আর মেজো রাজকুমারের হাতে না থাকায় বুলবুলির যে সব যাদুশক্তি আছে তার অধিকারী বড় বা মেজ রাজকুমার কেউই হোতে পারল না। বড় বা মেজ রাজকুমার বল্লেও তাই সোনার বুলবুলি গান করে না। কোনও জিনিষ এনে দেয় না, এমনকি দেশ-বিদেশের খবরও জানায় না।

ওদিকে ছোট রাজকুমারকে সমুদ্রে ফেলে দিলেও সোনার বুলবুলির ঐ সোনার আংটিটা ছোট-রাজকুমারের হাতে থাকায় কোনও বিপদ হোল না। সোনার আংটিটা বেলুনের মত হোয়ে ছোট রাজকুমারকে ঘিরে রাখল। ফলে হাঙ্গর বা সমুদ্রের হিংস্র প্রাণীরা ছোট রাজকুমারকে কিছুই করতে পারল না। বরং সোনার আংটি ছোট রাজকুমারকে ধীরে ধীরে নিয়ে এল সমুদ্রের তলায় সমুদ্ররাজের দেশে, সেখানে সাতসমুদ্রের রাজার মেয়ে সমুদ্রকন্যা বসে আছে।

সমুদ্র রাজার দেশে এর আগে এরকম সুন্দর সুপুরুষ রাজপুত্র আসে নি। তাই ছোট-রাজকুমারকে দেখে সমুদ্র রাজার মেয়ে সমুদ্রকন্যা মুগ্ধ হয়ে গেল। সমুদ্রকন্যা তখন ছোট রাজকুমারকে জিজ্ঞেস করল—সে কোথা থেকে এসেছে, কি চায় সেখানে ?

ছোট রাজকুমার যা যা হয়েছিল সবকিছুই বল্ল সমুদ্রকন্যাকে। বড় আর মেজ-রাজকুমারই যে তাকে মেরে ফেলবার জন্য সমুদ্রে ফেলে দিয়ে সোনার বুলবুলিকে নিয়ে গেছে তাও বল্ল।

সব শুনে সমুদ্রকন্যা বল্ল—ছোট-রাজকুমারের আর তার দেশে

ফেরবার দরকার নেই। দেশে ফিরলে হিংসুটে বড় আর মেজ রাজকুমার হয়ত তাকে আবার বিপদে ফেলবে। তার চেয়ে ছোট রাজকুমার সেই সমুদ্ররাজ্যেই থেকে যাক্। সাতসমুদ্রের রাজা সমুদ্ররাজের বয়স হয়ে গেছে। আর তার কোন ছেলে মেয়েও নেই। তাই ছোটরাজকুমার ইচ্ছে করলে সাতসমুদ্রের রাজা হয়ে সাতসমুদ্র শাসন করতে পারে।

রাজকন্যার ইচ্ছায় সমুদ্ররাজেরও মত ছিল। তিনিও ছোট রাজকুমারকে সমুদ্ররাজ্যে থেকে যেতে বল্লেন। সমুদ্ররাজ্যের পথে ঘাটে মণিমুক্তা ছড়ানো। কত বিচিত্র রঙের ফুল-ফল সেখানে। সব দেখে শুনে ছোটকুমার তো মোহিত।

রাজা-রাজকন্যার সংগে সাতসমুদ্রের সবাই ছোট রাজকুমারকে সেখানে থেকে যাবার জন্য অনুরোধ করতে লাগল। সবশুনে, সবার অনুরোধে, ছোটরাজকুমার সাতসমুদ্রের দেশেই থেকে গেল। আর তারপর সমুদ্রকন্যার সংগে খুব ধূমধাম করে ছোট-রাজকুমারের বিয়েও হোয়ে গেল। এত যে ঘটনা ঘটল, ছোট রাজকুমার কিন্তু সোনার বুলবুলির পায়ের সেই যাদুআংটি তার হাতে থেকে খোলে নি। তার কথাও অন্য কাউকে বলেনি, এমনকি সমুদ্রকন্যাকেও না।

একদিন একদল সমুদ্রপরী এসে সমুদ্রকন্যা আর তার বর ছোটরাজকুমারকে খবর দিল যে বৈশাল দেশের রাজার খুব অসুখ। ছোট-রাজকুমারকে না দেখতে পেয়ে মনের দুঃখেই রাজার অসুখ হয়েছে।

এই শুনে ছোট রাজকুমার সমুদ্র কন্যাকে নিয়ে বৈশাল দেশে যাবার জন্য তৈরী হোল। কিন্তু সাত সমুদ্র পেরিয়ে বৈশাল দেশে পৌঁছাতে অনেক সময় পার হয়ে যাবে। তাই অনেক চিন্তা করে বুলবুলির সোনার আংটিতে হাত দিয়ে ভাবল যদি একটা সেতু তৈরী হয়ে যায় তাহলে এক মুহূর্তেই তার বাবার

কাছে, বৈশাল দেশে পৌঁছাতে পারবে।

কি আশ্চর্য্য! সংগে সংগেই সোনার বুলবুলির সেই যাদু-আংটিটা একটা বিরাট সেতুতে পরিণত হোল। আর সেই সেতু দিয়ে ছোট রাজকুমার সমুদ্রকন্যাকে নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এল। সমুদ্রকন্যার মাথার মুকুটে জ্বলছে সাত-সমুদ্রের সাতরঙা সাতটি হীরে। আর তার মাঝখানে ঝকমক করছে নাগমণি।

ছোট রাজকুমারকে রাজ্যে ফিরতে দেখে বড় আর মেজ রাজ-কুমারের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। ছোট ছেলেকে ফিরতে দেখে বৈশাল-রাজের অসুস্থ মুখটা হাসির জোয়ারে ভরে গেল। ছোট রাজকুমারের সংগে অপূর্ব সুন্দরী সমুদ্র রাজার কন্যাকে দেখে বৈশাল রাজা তো আরও খুশী। রাজা ছোট রাজকুমার আর সমুদ্রকন্যাকে আশীর্বাদ করলেন।

এইবার বড় আর মেজো-রাজকুমার রাজার কাছে এসে স্বীকার করল তারা কি অপরাধ করেছে। তারা ছোট ভাইকে বল্ল তাদের ক্ষমা করে দিতে।

সব কথা শুনে রাজা তো ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি বড় আর মেজরাজকুমারকে নির্বাসন দেবেন ঠিক করলেন। কিন্তু ছোট রাজকুমারই বাবাকে বার বার অনুরোধ করল দাদাদের ক্ষমা করতে। ছোট ছেলের এই উদারতা দেখে রাজা খুশী হোলেন। তিনি ছোট ছেলের অনুরোধে বড় আর মেজ ছেলেকে ক্ষমাও করলেন।

সোনার বুলবুলি কিন্তু এতদিন চুপচাপ করে খাঁচায় বসে থাকত। কোন গানও করত না, কোথাও উড়তেও যেত না। কিন্তু যেই ছোট রাজকুমার সোনার বুলবুলির সামনে গেল, বুলবুলি চিক্‌মিক্ করে আনন্দে ডেকে উঠল। মিষ্টিসুরে গান গাইতে গাইতে ছোট রাজকুমারের কাঁধে এসে বসল।

এরপর ছোট রাজকুমার বাবার আদেশ নিয়ে, সোনার বুলবুলি আর সমুদ্রকন্যাকে নিয়ে সাত সমুদ্রের দেশে ফিরে এল। ফেরবার সময় কিন্তু সেই সোনার যাদু-আংটির সেতু দিয়েই তারা সমুদ্র রাজ্যে ফিরল।

সাতসমুদ্রের দেশে যখন তারা ফিরে এল, তখন সেই যাদু-আংটির সেতু হঠাৎ আবার ছোটটি হোয়ে ছোট কুমারের হাতে ফিরে গেল। তাই দেখে সোনার বুলবুলি মিষ্টি সুরে গেয়ে উঠল। সেই সুন্দর গানে সাত সমুদ্রের গাছ-পালা, ফুল-ফল লোকজন সবাই মুগ্ধ হোয়ে গেল।

ছোট রাজকুমার এরপর সাত সমুদ্রের রাজা হোয়ে সুন্দরভাবে রাজ্য চলতে লাগল। কোনও কঠিন সমস্যা হলেই সোনার বুলবুলি তার সমস্যার সমাধান করে দেয়। ফলে, দিন দিন ছোট রাজকুমারের সুনাম বাড়তেই লাগল। তাই সমুদ্ররাজ্যে ছোট রাজকুমার আর তার সোনার বুলবুলির আদর দিন দিন বেড়ে গেল। এসব দেখে সমুদ্রকন্যার মনেও সুখের সীমা থাকল না।

উদার হৃদয় দিয়ে ছোট রাজকুমার সবাইকে জয় করল। উদারতারই পুরস্কার সোনার বুলবুলি, সমুদ্রকন্যা আর সাত-সমুদ্রের সিংহাসন।
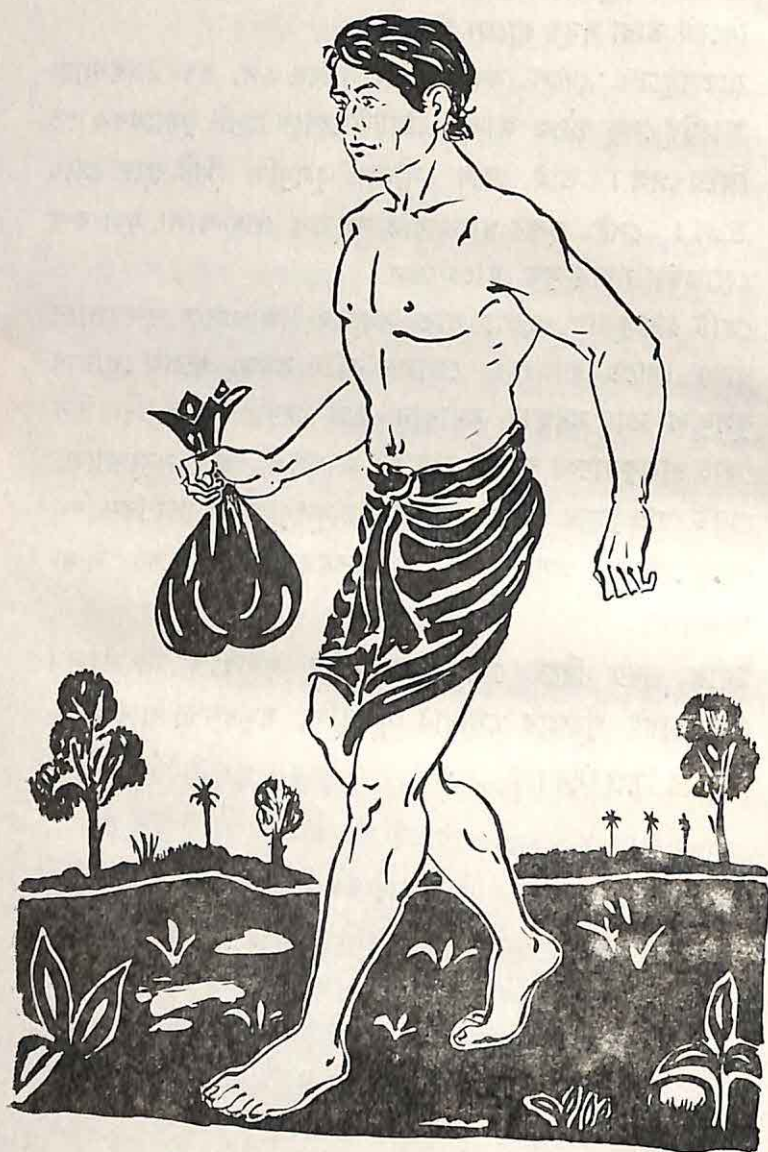
রিপুদমন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে রওনা হোল

শক্তিধর রিপুদমন

কোনও এক গ্রামে এক গরীব চাষী ছিল। চাষী তার স্ত্রীকে নিয়ে ভগবানের নাম কোরে আর চাষ-আবাদ কোরে কোনও রকমে দিন কাটিয়ে দিত। যা কিছু সামান্য তারা পেত তাতেই তারা আনন্দে দিন চালাত। শুধু একটাই মনে দুঃখ যে তাদের কোনও ছেলেমেয়ে ছিল না। তাই এই গরীব চাষী আর তার বৌ প্রতিদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত ভগবান যেন তাদের এক শক্তিধর ছেলে দেন। চাষী আর তার বৌ-এর এই প্রার্থনা শুনে ভগবান একদিন সত্যিই এই গরীব চাষীকে এক বলবান-সুন্দর-শক্তিধর ছেলে দিলেন।

ছেলেকে পেয়ে চাষী আর তার বৌ-তো মহাখুশী। দেখতে দেখতে ছেলে বড় হতে লাগল। আর দিনে দিনে অন্য সব ছেলেদের চেয়ে বেশী বলবান হয়ে উঠতে লাগল। চাষী আর তার বৌ ছেলের নাম রাখল শক্তিধর রিপুদমন।

রিপুদমনের বয়স যখন সতের আঠারো বছর তখন তার চেহারা হোল বিরাট পালোয়ানের মত। প্রায় আটফুট লম্বা, বিরাট বিরাট লম্বা পা, শাল গাছের মত শক্ত-শক্ত হাত, মাথায় ঝাক্‌ড়া চুল, গায়ে প্রচণ্ড শক্তি।

একদিন রিপুদমন তার বাবা মাকে বল্ল—"দেখ, আমি এখন আর ছোট নেই। আমি দেশ-বিদেশ ঘুরতে বেরুব।"

চাষী একথা শুনে বল্ল—"তাতো যাবিই। কিন্তু খালি হাতে

যাওয়াতো ঠিক হবে না। তোর কোন অস্ত্র-সস্ত্রও নেই। কি করে যাবি তুই ?"

তখন রিপুদমন ভাবল—ঠিকইতো। খালি হাতে যাওয়াতো খুব বিপদের। তাই সে একমাস ধরে যত্ন করে একমণ লোহা দিয়ে একটা বিদঘুটে মুগুর তৈরী করল। মুগুরটার চারদিকে অজস্র সরু সরু ছুঁচলো মুখ, ফলে এই মুগুরটা দিয়ে একবার কাউকে মারলে তার আর বাঁচার উপায় ছিল না। সত্যিই রিপুদমনের অস্ত্রটা ছিল বিদঘুটে ধরনের।

রিপুদমন এই বিদ্‌ঘুটে মুগুরটা তার বাবাকে দেখিয়ে বল্ল—"দেখ বাবা আমার অস্ত্রটা। এবার আমাকে যেতে দিতে তোমার নিশ্চয়ই আর কোনও আপত্তি থাকবে না।"

চাষী আর কি করে। বাধ্য হয়েই ছেলেকে দেশ ভ্রমণের মত দিল। কিন্তু রিপুদমনের মা, চাষীর বৌ খুব কান্নাকাটি শুরু করল।

রিপুদমনের চাষী-মা বল্ল—"এইটুকু ছেলে তুই। একলা গেলে বিপদে পড়বি। সামান্য এই একটা অস্ত্রে কি হবে ?"

শক্তিধর রিপুদমনের তখন একটুও বাড়ীতে থাকার ইচ্ছে নেই। সে বল্ল—"আমার কিছু হবে না মা। দেখো, আমি ঠিক থাকব। তুমি আমায় আশীর্বাদ কর তাহলেই সব বিপদ কেটে যাবে। দেখবে, আমি রাজ্য জয় করে, রাজকন্যা নিয়ে ফিরে আসব।"

ছেলের জেদ দেখে, তার মনে এরকম বিরাট আশা দেখে, মা আর কি করে। ছেলেকে যেতে দিতে বাধ্য হোল।

কিন্তু যাবার সময় রিপুদমনকে তার মা বল্ল—"মনে রাখিস, সেই সত্যিকার শক্তিধর যে বিপদে পড়লেও ভয় পায় না, সাহস হারায় না, ধৈর্য্য হারায় না। এ-কথাটা মনে রাখলেই দেখবি বিপদ কেটে যাবে। আর কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করবি।"

এরপর বাবা আর মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে শক্তিধর রিপুদমন বাড়ী থেকে রওনা হোল। সংগে একমণ ওজনের তার ঐ বিদঘুটে গদাটা। গ্রাম ছেড়ে রিপুদমন যখন ধীরে ধীরে চলতে স্থুরু করল, সব লোকজন তার ঐ বিরাট চেহারা আর হাতে ওরকম বিদঘুটে গদা দেখে ভয় পেয়ে গেল। সবাই ভাবল নিশ্চয়ই ঐ লোকটা ডাকাত কিংবা পাগল। তাই হুট-পাট করে সবাই তার সামনে থেকে ভয়ে পালিয়ে যেতে লাগল। এসব দেখে রিপুদমন ঠিক করল গ্রামের রাস্তা দিয়ে না গিয়ে জংগলের মধ্যেকার পথ দিয়ে যাবে, তাহলে লোকজন তাকে দেখতেও পাবে না, আর ভয়ে পালিয়েও যাবে না।

জংগলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে একটা হুটো করে গ্রাম পার হওয়ার পর রিপুদমন একটা মাঠের ধারে এসে পড়ল। সেখানে সে দেখতে পেল এক জিরজিরে চেহারার চাষী জমি চাষ করছে। একটুকু ছোট জমি চাষ করতেই সেই লোকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার শরীর দিয়ে দর দর করে ঘাম ঝরছে। লাঙ্গল টানতে টানতে সেই লোকটার জিরজিরে গরুটার মুখ দিয়েও ফেনা বেরুচ্ছে। এসব দেখে রিপুদমনের খুব কষ্ট হোল।

রিপুদমন তখন চাষীকে গিয়ে বল্ল—"ভাই এইটুকু জমি চাষ করতেই দেখছি তুমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।"

রিপুদমনের কথা শুনে চাষীতো খুব রেগে গেল। সে ভাবল রিপুদমন বোধ হয় তাকে ঠাট্টা করছে।

চাষী তখন রেগে রিপুদমনকে বল্ল—"পালোয়ান হলেই হয় না, বুঝেছ হে ছোকরা। এই জমির মাটি খুব শক্ত। তাই এই মাটি চষতে এত কাহিল হয়ে পড়েছি। শুধু আমি নই, আমার গরুটাও কত ক্লান্ত দেখতে পারছ না? মুখে কথা বলা খুব সোজা, কিন্তু কাজ করা খুব কঠিন বুঝেছ হে।"

চাষীকে রাগতে দেখেও রিপুদমন হেসে বল্ল—"তুমি রাগ

করছ কেন ভাই। আমি তোমায় ঠাট্টা করিনি। তুমি দেখছি খুবই ক্লান্ত। তোমার গরুটারও সে রকম অবস্থা। এক কাজ কর না কেন, তুমি আর তোমার গরু দুজনেই একটু বিশ্রাম করে নাও। আমি একলাই জমিটায় লাঙ্গল দিয়ে দিচ্ছি।”
রিপুদমনের এই কথায় চাষীর মুখে হাঁসি ফুটল। সে গরুটাকে খুলে দিল লাঙ্গল থেকে। গরুটা ঘাস খাবার জন্য বনে চলে গেল। চাষীও হাত পা ছড়িয়ে গাছের তলে বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়ল।
এদিকে শক্তিধর রিপুদমন তার লম্বা-লম্বা পা ফেলে আর প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে লাঙ্গল নিয়ে মাঠ চষতে সুরু করল। আর মাঠের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত চোখের পলকে চষে ফেলতে লাগল। মাঠ চষতে চষতে রিপুদমন চাষীকে বল্ল—“চাষী ভাই কিছু ভেব না। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঠটা পুরোপুরি চষা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তুমি বরং আমাদের খাবার ব্যবস্থা কর। আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।”
চাষী বাড়ীতে গেল খাবার আনতে। কিছুক্ষণ পর যখন সেই চাষী খাবার নিয়ে ফিরল, দ্যাখে রিপুদমন সমস্ত মাঠটাই চষে ফেলেছে। ফসল বুনবার জন্য মাঠটা পুরোপুরি তৈরী। তাই দেখে চাষীর তো আর আনন্দ ধরে না। আজ কয়েকদিন ধরে চেষ্টা করেও মাঠটা লাঙ্গল দেওয়া সে শেষ করে উঠতে পারছিল না। এবার রিপুদমনকে বারবার ধন্যবাদ জানাল।
চাষী আর রিপুদমন গাছের তলায় বসে খাওয়া শেষ করল। তারপর চাষী রিপুদমনকে ধন্যবাদ জানিয়ে, লাঙ্গল নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হবার জন্য তৈরী হোল।
রিপুদমন তখন চাষীকে বল্ল—“না, এখন তোমাকে আমি লাঙ্গল দিচ্ছি না। তোমার ছেলে-মেয়ে-বৌ সবার খাওয়া-পরা এইটুকু চাষ করে চলতেই পারে না। আরও যে সব ক্ষেত খালি

পড়ে আছে সেগুলো আমি তোমার জন্য চাষ করে দিচ্ছি। তাতে আরো বেশী ফসল তুমি বিক্রী করার জন্য পাবে।"

এ কথা শুনে চাষী বল্ল—"এ অসম্ভব কথা। আমার মাত্র ঐটুকু জমি আছে। এরপর আর যে সমস্ত জমি দেখতে পাচ্ছ, এ সব এখানকার রাজার। তুমি সেই ক্ষেত চাষ করতে গেলে এই রাজা আমার উপর রেগে যাবে। তখন আমার বিপদ হবে।"

রিপুদমন এ কথা শুনে বল্ল—

"বাঃ, এতো বেশ মজার কথা। জমি শুধু শুধু পড়ে আছে। সেই খালি জমি চাষ করে যদি তোমার উপকার হয় তাহলে রাজা রাগ করতেই পারে না। আর তবুও যদি রাজা রাগ করে, তখন না হয় রাজার সংগে বোঝাপড়া আমিই করব।"

রিপুদমনের সেই বিশাল চেহারা, ইহা পেশীওয়ালা পালোয়ানী হাত, আর কড়া মেজাজ দেখে চাষী ভয়ে আর কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকল। রিপুদমনও চাষীর লাঙ্গল নিয়ে রাজার খালি জমি চাষ করতে আরম্ভ করল। এই করে সেদিন অনেকটা রাজার জমি রিপুদমন চাষ করে ফেল্ল।

বিকেলবেলায় রাজা জানলা দিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখেন তার খালি মাঠের কিছুটা কে যেন চষে ফেলেছে। তাই দেখে রাজার খুব রাগ হোল। কিন্তু সেদিন রাজা আর এই নিয়ে হৈ-হল্লা করলেন না।

দ্বিতীয়দিনে রিপুদমন আবার চাষ করতে গেল। সেদিন সে আরও খানিকটা রাজার জমি চাষ করে ফেল্ল। বিকেলবেলায় রাজা আবার জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখেন তার খালি জমি বেশ অনেকটা কে যেন চষে ফেলেছে। সেদিন কিন্তু রাজা খুবই রেগে গেলেন। তবুও সেদিন রাজা কিছু বল্লেন না, ভাবলেন, দেখি ব্যাপারটা আর কতদূর গড়ায়।

তৃতীয় দিনেও রিপুদমন আবার রাজার জমি চাষ করতে সুরু

করল। সেদিন চাষ করতে করতে প্রায় রাজপ্রাসাদের কাছে এসে গেল। এদিকে রাজাও সেদিন অপেক্ষা করে আছেন জানলার কাছে, দেখবার জন্য, কে তার জমি বিনা অনুমতিতে চাষ করছে। রিপুদমনকে চাষ করতে দেখে রাজা প্রচণ্ড ক্ষেপে গেলেন।

রাজা ক্ষেপে গিয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে মাঠে নেমে এলেন। রাজার পেছনে এল রাজার মন্ত্রী, রাজার সেনাপতি, পাত্র-মিত্র সবাই। রাজা রেগে বল্ল—"কি-হে, এই জমি চাষ করবার অধিকার কোথা থেকে পেলে ?"

রিপুদমন কিন্তু রাজা-মন্ত্রী-পাত্র-মিত্র কাউকে দেখে ভয় পেল না। সে হেসে বল্ল—

"কেউ দেয়নি। আমি নিজের ইচ্ছেয় করেছি। চাষী ভাই-এর জমি খুব কম। তাতে যা ফসল হয় তার থেকে চাষী ভাই-এর সংসার চলে না। তাই তারা সব আধপেটা খেয়ে থাকে। আপনার এই বিরাট জমি তো খালিই পড়ে আছে। এতো আপনার কোন কাজেই লাগে না। কিন্তু এই জমি চাষ করলে চাষী ভাই-এর উপকার হবে। তাই আমি চাষ করছি।"

এসব কথা শুনে রাজা ক্ষেপে বল্লেন—"আমার জমি আমি চাষ করি বা না করি তোমার কি তাতে ? তুমি এক্ষুনি লাঙ্গল তুলে নিয়ে এ জমি ছেড়ে চলে যাও। নয়ত আমার সৈন্যরা এসে তোমাকে পিটিয়ে আধমরা করে দেবে।"

রিপুদমন হেসে বল্ল—"দেখুন রাজামশাই কেন মিছিমিছি ভয় টয় দেখাচ্ছেন। আমার খুশী, আমি পড়ে থাকা খালি জমি চাষ করছি। আর আপনার যা খুশী আপনিও তাই করুন। শুধু শুধু তর্ক করে লাভ কি ?"

এই কথা শুনে রাজা রাগে গরগর করতে করতে প্রাসাদে ফিরে গেলেন। সংগে সংগে সেনাপতিকে আদেশ দিলেন একশ সৈন্য

নিয়ে রিপুদমনকে মেরে মাঠ থেকে যেন তাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর তার সংগে ঐ লাঙ্গলটাকেও যেন ভেঙ্গে ফেলে দেওয়া হয়। রাজার কথামত সেনাপতি একশ সৈন্য নিয়ে রিপুদমনকে মারতে এল। রিপুদমনও তখন ছুটে গিয়ে তার সেই একমণি বিদঘুটে গদাটা নিয়ে এসে লড়াই সুরু করল। সেই গদার প্রচণ্ড ঘায়ে একে একে রাজার একশ সৈন্য মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্ করতে করতে মারা গেল। এই দেখে সেনাপতি ছুটে গিয়ে রাজাকে এ খবর দিল।

রাজা তখন বল্লেন—"ঠিক আছে, পাঁচশ সৈন্য নিয়ে গিয়ে ঐ বদমাইশ লোকটাকে বেঁধে নিয়ে এস আমার কাছে।"

সেনাপতিও পাঁচশ সৈন্য নিয়ে রিপুদমনকে বেঁধে নিয়ে আসতে গেল। রিপুদমনের গায়ে তো প্রচণ্ড শক্তি। ভগবান তো তাকে শক্তিধর করে পাঠিয়েছেন। তাছাড়া বাবা-মার আশীর্বাদও তার সহায়। এ ছাড়া রিপুদমন জানে পরের উপকারের জন্যই সে এসব করছে। তাই রিপুদমন কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে তার একমণি গদা নিয়ে রাজার সৈন্যদের ঠাঁ-ঠাঁ-করে পেটাতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে পাঁচশ রাজার সৈন্য আর তার সংগে সেনাপতিও গদার ঘায়ে আধমরা হয়ে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

রাজা প্রাসাদের জানলা থেকে সব দেখছিলেন। সেনাপতি আর তার পাঁচশ সৈন্যকে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতে দেখে রাজার আর কোন জ্ঞান থাকল না। তিনি রাগে কড়মড় করতে করতে, একহাজার সৈন্য নিয়ে নিজেই মাঠে নেমে এলেন রিপুদমনকে বন্দী করার জন্য। রিপুদমনও তখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। সেও ঠিক তখন আবার একমণি গদাটা বোঁ-বোঁ করে ঘোরাতে শুরু করল। গদার প্রচণ্ড আঘাতে এক এক করে রাজার সেই হাজার সৈন্য মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রিপুদমন তখন গদাটা নিয়ে

রাজার দিকে এগুতে লাগল।
রিপুদমনের সেই চেহারা আর তার বিদ্‌ঘুটে গদাটা দেখে রাজার মুখতো ভয়ে শুকিয়ে গেছে। রাজা তখন হাত জোড় করে রিপুদমনকে বল্ল—"শক্তিধর ছেলে, আমায় মেরে ফেলো না। তার বদলে আমি আমার ছোট মেয়ের সংগে তোমার বিয়ে দেব। আর আমার যে জমি তুমি চাষ করেছ এরপর থেকে তার ফসলও তোমার ঐ চাষী বন্ধুকে তুলতে দেব।"
একথা শুনে শক্তিধর রিপুদমন খুশী হয়ে বল্ল—"ঠিক আছে। এতে আমার আপত্তি নেই। তবে রাজার ঐ জমিটা চষা এখনও শেষ হয়নি। আজ বিকেলের মধ্যেই এই জমি আমি চষে ফেলব। তারপর আপনি গাড়ী পাঠালে আমি রাজপ্রাসাদে যাব রাজকন্যাকে বিয়ে করবার জন্য।"
সন্ধ্যেবেলায় রাজার ঐ জমিটা চাষ করে, রিপুদমন চাষীভাইকে তাতে ফসল বুনতে দিয়ে এল। চাষী ভাই রিপুদমনের এই সাহস আর উপকারের জন্য তাকে বারবার ধন্যবাদ জানাল। তারপর বল্ল—"শক্তিধর তোমাকে এই ছোট্ট বাঁশীটা দিচ্ছি। কোনও বিপদ হোলে তিনবার এই বাঁশীটা বাজিও। তাহলে দেখবে বিপদ এলেও তোমার কোনও ক্ষতি হবে না। এই বাঁশী আমাকে আমার বাবা দিয়ে গিয়েছিল। এই বাঁশীর জন্যই আজ পর্য্যন্ত আমার কোনও ক্ষতি হয়নি।"
শক্তিধর রিপুদমন চাষীর বাঁশীটা নিয়েচাষীকে ধন্যবাদ জানাল। তারপর রাজার পাঠানো গাড়ীতে চড়ে বসল রাজপ্রাসাদেযাবার জন্য। কিন্তু গাড়ীতে চড়তেই রিপুদমনের বিরাট শরীরের চাপে কাঠের গাড়ীটা গেল ভেঙ্গে। রাজা তখন আরও একটা মজবুত কাঠের গাড়ী পাঠালেন। সেটাও ভারী রিপুদমনের চাপে মড়-মড়-মড়াৎ করে ভেঙ্গে গেল। শেষে রাজা একটা যুদ্ধের জন্য তৈরী লোহার গাড়ী পাঠালেন রিপুদমনকে আনবার জন্য।

সেই লোহার গাড়ীতে চড়ে রিপুদমন রাজপ্রাসাদে এল।
এদিকে তো রাজকন্যা রিপুদমনের প্রচণ্ড শক্তি আর সাহসের কথা শুনে শুনে তাকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিল।
রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের কাছে রাজকন্যাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শক্তিধর রিপুদমন বল্ল—
"সুন্দরী রাজকন্যা, তুমি জান বোধ হয় রাজা বাধ্য হয়ে তোমার সংগে আমার বিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন। কিন্তু তুমি যদি না চাও তবে এ বিয়ে হবে না। তবে তুমি যদি আমায় বিয়ে করতে রাজী হও তবেই আমি তোমায় বিয়ে করতে পারি।"
রাজকন্যা রিপুদমনের শক্তি আর সাহসের কথা শুনেছিল। এখন তার মুখের সুন্দর কথা শুনে মুগ্ধ হোল। রাজকন্যা তখন বল্ল—
"তুমি শুধু শক্তিধরই নও, তুমি উদার হৃদয়ও। তুমি জোড় করে আমায় বিয়ে করতে চাও না বলেই আমি তোমায় বিয়ে করতে পারি। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা শক্ত কাজ করতে হবে। তুমি তাতে সফল হোলে তবেই তোমার সংগে আমার বিয়ে হবে।"
রাজকন্যার এইরকম স্পষ্ট কথা শুনে শক্তিধর বল্লে—"এতো খুবই ন্যায্য কথা। তোমার পরীক্ষায় আমি সফল না হলে নিশ্চয়ই আমাকে তুমি বিয়ে করবে না। এখন বল তোমার সেই কঠিন কাজটা কি?"
রাজকন্যা তখন বল্ল—"দেখ শক্তিধর, এই রাজ্য থেকে রওনা হোয়ে তিনটে নদী আর তিনটে পাহাড় পার হোলে তুমি পৌঁছাবে বিন্ধ্যগড়ের বিশাল রাজপ্রাসাদের সামনে। সেই রাজ প্রাসাদের দেওয়ালগুলো বিরাট মোটা-মোটা পাথরে তৈরী। ঐ বিন্ধ্যগড়ের রাজার সংগে আমার দিদির বিয়ে হয়। সেখানে তারা খুব সুখেই ছিল। কিন্তু মায়াবী খোক্ষসরাজ দিদিকে বিয়ে করবার জন্য ঐ বিন্ধ্যগড় আক্রমণ করে। কিন্তু

তাতেও বিন্ধ্যগড়ের রাজা দিদিকে ঐ খোক্কসরাজের হাতে ছেড়ে না দেওয়ায় ঐ মায়াবী খোক্কসরাজ সমস্ত বিন্ধ্যগড়কে অন্ধকার করে দিয়ে মায়াবলে সবাইকে পাথর বানিয়ে দিয়েছে। মোট কথা, এরপর বিন্ধ্যগড়ে রাজা-রাণীকে কেউ আর দেখেনি। দিদির এই দুঃখ যতদিন দূর না হয় ততদিন কাউকেই বিয়ে করব না এই আমার প্রতিজ্ঞা। তাই দিদিদের তুমি যদি উদ্ধার করতে পার তবেই তোমার সংগে আমার বিয়ে হবে।"

এসব শুনে শক্তিধর রিপুদমন বল্ল—"ওঃ, এতো সহজ ব্যাপার। তুমি কিচ্ছু ভেব না রাজকন্যা। আমিই উদ্ধার করব বিন্ধ্য-গড়ের রাজাকে, তোমার দিদিকে, ঐ মায়াবী খোক্কসরাজের হাত থেকে। আমি যতদিন না ফিরি, ততদিন তুমি শুধু অপেক্ষা কোরে থেকো।"

এই বলে রিপুদমন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে রওনা হোল। সংগে নিল তার একমণি ঐ বিদঘুটে গদাটা, আর সেই সংগে চাষী-ভাই-এর দেওয়া যাদু বাঁশীটা।

রাজপ্রাসাদ ছেড়ে কিছুদূর যাওয়ার পর রিপুদমন শুনতে পেল কে যেন মিন্‌মিন্ করে আস্তে আস্তে তাকে ডাকছে। রিপুদমন এদিক-ওদিক চারদিক তাকিয়েও শুধুমাত্র এক খেঁকশেয়ালী ছাড়া আর কাউকে না দেখতে পেয়ে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু তখনই আবার শুনতে পেল কে যেন বলছে—"হে বিরাট শক্তিধর, আমাকে বাঁচাও। আমার ভীষণ বিপদ। আমি তোমারই সামনে দাঁড়িয়ে আছি।"

একথা শুনে রিপুদমন সামনের দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকল। তখন তার চোখে পড়ল একটা আঙ্গুলের মত ছোট্ট মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথায় জরির টুপি, কোমরে তলোয়ার, সে লড়াই করছে বিরাট খেঁকশেয়ালটার সংগে। কিন্তু ছোট্ট মানুষটি অত বড় খেঁকশেয়ালির সংগে পেরে উঠবে কেন?

এইটা দেখা মাত্র রিপুদমন তার একমণি গদা দিয়ে ধাঁ করে প্রচণ্ড আঘাত করল খেঁকশেয়ালটাকে। খেঁকশেয়ালী সেই আঘাতেই মারা পড়ল।

তখন ক্ষুদে রাজপুত্র রিপুদমনকে বল্ল—"শক্তিধর, তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমার জন্যই আমার জীবন রক্ষা পেয়েছে। তোমার এত শক্তি, তাই হয়ত তোমার কোন দরকার নাও হোতে পারে, তবুও বলছি, যদি সত্যি কখনও দরকার পড়ে এই ছোট্ট গাছের পাতাটা ডান হাতে নিয়ে ভাববে ছোট হোতে চাই। যত ছোট হোতে চাইবে, দেখবে ঠিক তত ছোটই হয়ে গেছ। চাইলে আমার চেয়েও ছোট্ট হয়ে যেতে পার। আবার যখন দরকার ফুরিয়ে যাবে তখন ঐ পাতাটা বাম হাতে নিয়ে ভাববে—নিজের চেহারায় ফিরে যেতে চাই। দেখবে, ঠিক নিজের চেহারায় ফিরে গেছ। এই পাতায় ছোট হোতে পার, কিন্তু নিজের চেহারাকে আর বড় কোরতে পারবে না।"—এই বলে ক্ষুদে রাজপুত্র রিপুদমনকে একটা গাছের ছোট্ট পাতা দিয়ে লুকিয়ে রাখতে বল্ল।

রিপুদমন পাতাটা জামার মধ্যে লুকিয়ে রেখে, ছোট্ট রাজপুত্রকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার চলতে সুরু করল। চলতে চলতে পার হোল তিনটে নদী, তারপর তিনটে পাহাড়। আর তারপর এসে পৌঁছাল বিন্ধ্যগড়ের প্রাসাদের সামনে। প্রাসাদের চারদিক নিঃস্তব্ধ, অন্ধকার। রিপুদমন তখন ভাবছে এরপর কি করবে। ঠিক সেই সময় বিরাট এক রাক্ষস হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ করতে করতে রিপুদমনকে আক্রমণ করল। রিপুদমনও একটুও ভয় না পেয়ে নিমেষের মধ্যে একমণি গদাটা হাতে নিয়ে বোঁ-বোঁ করে ঘুরিয়ে রাক্ষসকে পেটাতে লাগল। পেটাতে পেটাতে রাক্ষসকে মাটিতে ফেলে দিল।

রাক্ষস তখন হাত জোড় করে হাঁউ-মাঁউ করে বল্ল—"শক্তিধর

মানুষ, আমাকে আর মেরো না। ছেড়ে দাও। আমি তোমার বন্ধু হোয়ে তোমাকে সাহায্য করব। লক্ষীটি আমাকে ছেড়ে দাও।"

তখন রিপুদমন রাক্ষসকে ছেড়ে দিয়ে বল্ল—"ঠিক আছে। তুমি যখন বন্ধু হবে বলেছ তখন তোমায় ছেড়ে দিলাম। তাহলে বলতো রাক্ষসবন্ধু, আমাকে মারবার জন্য কে তোমায় পাঠিয়েছে? সে থাকে কোথায়?"

রাক্ষসটা বল্ল—"মানুষবন্ধু, আমি নিজের ইচ্ছেয় তোমাকে মারতে আসিনি। খোক্কসপুরীর রাজা যাদু খোক্কসই সব কিছুর জন্য দায়ী। এই রাজ্য, তার রাজা-রাণী-পাত্র-মিত্র সবাইকেই সেই খোক্কসরাজা যাদুখোক্কস যাদুবলে পাথর করে দিয়েছে। এছাড়া তিনটে বেঁটেখোক্কসকে রেখে দিয়েছে - এখানকার প্রাসাদের চারপাশ পাহারা দেবার জন্য। আর বাইরের এই চারপাশের জংগল পাহারা দেওয়ার জন্য আমাকে রেখেছে। এই যাদুখোক্কসই হচ্ছে মহাপাজী। আমাদের কারুরই ওর হাত থেকে রেহাই পাবার উপাই নেই। তাই সেই যাদুখোক্কসের হাত থেকে আমাদের সবাইকে যদি উদ্ধার করতে পার তবে আমরা সবাই তোমার বন্ধু হোয়ে থাকব।"

সবকিছু শুনে শক্তিধর একটু চিন্তায় পড়ল। এইবার শক্তিধর বুঝতে পারল শুধুমাত্র গায়ের জোরে, বা একমণি গদা দিয়ে যাদুখোক্কসকে হারানো যাবে না।

তাই তখন বন্ধু-রাক্ষসকে জিজ্ঞেস করলে—"হ্যাঁ ভাই রাক্ষস, তুমি শুধু বলতে পার, কি করে সেই তিনটে বেঁটে-খোক্কসের দেখা পাব? আর কোথায় দেখা পাব?"—এই কথা বলার পর রিপুদমন জানাল কেন সে ঐখানে এসেছে। তার সংগে এও বল্ল যে যাদুখোক্কসকে মেরে সবাইকে উদ্ধার করবে, এই তার প্রতিজ্ঞা।

এইসব শুনে বন্ধু-রাক্ষস বল্ল—"তুমি যেমন শক্তিধর হয়ত তিনটে বেঁটে-খোক্কসকে মেরে ফেলা তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু যাদুকর যাদুখোক্কসকে বন্দী করা বা মেরে ফেলা সবচেয়ে কঠিন কাজ। যাই হোক, তুমি যখন বুদ্ধিমান আর শক্তিশালী তোমাকে কোনও উপদেশ দেওয়া ঠিক হবে না। শুধু এই অনুরোধ সামনের ঐ গুহাটার মধ্যে দিনমানে লুকিয়ে থেকো। প্রাসাদের মধ্যে বেঁটেখোক্কসদের সংগে লড়াই কোরো না, তাহলে যাদুখোক্কস শুনতে পাবে, আর তাহলে তোমার রক্ষা থাকবে না। আমি বরং সন্ধ্যেবেলায়—যখন বেঁটেখোক্কসরা প্রাসাদের চারদিকে পাহারা দেবার জন্য ঘুরবে তখন এক এক করে তাদের গুহাটার কাছে ডেকে আনব। তুমি একলা হয়ত একটা বেঁটেখোক্কসকে মেরে ফেলতে পারবে। এইভাবে এক এক করে তিনটে বেঁটেখোক্কসকে মারবার পর তবে যাদু-খোক্কসের সংগে বোঝাপড়া করতে যেও।"

রিপুদমন বন্ধুরাক্ষসের কথামত জংগলের মধ্যেকার গুহাটায় লুকিয়ে থাকল। সন্ধ্যেবেলায় এক নম্বর বেঁটেখোক্কস যখন প্রাসাদের চারপাশ পাহারা দিতে দিতে রাক্ষসের কাছাকাছি এসে পৌঁছাল তখন গুহাটার সামনে থেকে রাক্ষস হঠাৎ চিৎকার করে উঠল—

"বেঁটেখোক্কস তাড়াতাড়ি এস, আমার ভীষণ বিপদ।" এই চিৎকার শুনে এক নম্বর বেঁটেখোক্কস দৌড়ে ছুটে এল গুহাটার সামনে। জিজ্ঞেস করল রাক্ষসটাকে—"ব্যাপার কী?"

রাক্ষসটা বল্ল—"গুহাটার মধ্যে এক বিদঘুটে চেহারার লোক এসে লুকিয়ে আছে। আমার একলা গুহায় ঢুকতে সাহস হচ্ছে না। আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি, তুমি বরং একবার ভিতরে ঢুকে দেখতো ঐ লোকটাকে শেষ করতে পার কি না।"

একথা শুনে বেঁটেখোক্কস বল্ল—"ভয় কি। আমি তো আছি।"

—তারপর বেঁটেখোক্কস চিৎকার করে উঠল—"কে আছিস ভিতরে? বাইরে আয় একবার। তোকে কি করে ঠাণ্ডা করি দেখনা।"

একনম্বর বেঁটে খোক্কসের চিৎকার শেষ হবার সংগে সংগেই শক্তিধর রিপুদমন গুহার বাইরে এল তার সেই একমণি গদাটা হাতে নিয়ে। বাইরে এসেই চাষীর দেওয়া যাদু বাঁশীটা ফুঁ-ফুঁ করে তিনবার বাজাল। তারপর সুরু করল প্রচণ্ড লড়াই। বেঁটে খোক্কস হাজার চেষ্টা করেও কিন্তু রিপুদমনকে কাৎ করতে পারল না। তার কারণ চাষীর দেওয়া সেই যাদু বাঁশীটা রিপুদমনকে বারবার বিপদ থেকে রক্ষা করতে লাগল। লড়তে লড়তে রিপুদমন এক নম্বর খোক্কসকে একবার বাগে পেয়ে ধাঁ ধাঁ করে তার একমণি মুগুরটা চালিয়ে দিল। আর সেই বিদঘুটে গদাটার মারের চোটে একনম্বর বেঁটে খোক্কস তো মাটিতে পড়ে সংগে সংগেই মারা গেল।

রিপুদমন তখন বন্ধু-রাক্ষসকে বল্ল—"বন্ধু একবার প্রাসাদের ভিতরে গিয়ে দেখে আসি যাদু খোক্কস এখন কি করছে। এক নম্বর বেঁটে খোক্কস যে মারা গেছে সেটা বুঝতে পেরেছে কিনা সেটাও জানা দরকার।"

একথা শুনে বন্ধু-রাক্ষস বল্ল—"খবরদার, প্রাসাদের ভিতরে যেও না। তোমাকে প্রাসাদের ভিতরে দেখতে পেলে যাদু খোক্কস যাদু বলে তোমাকে পাথর করে দেবে।"

রিপুদমন বল্ল—"দেখই না রাক্ষস-বন্ধু, কি করি আমি। যাদু খোক্কস ধরতেই পারবে না আমাকে।" —এই বলে রিপুদমন ক্ষুদে রাজপুত্রের দেওয়া গাছের যাদু-পাতাটা ডান হাতে নিয়ে পিঁপড়ের মত ছোট্টটি হয়ে গেল। তাই দেখে বন্ধু রাক্ষস তো অবাক। সে এবার বুঝতে পারল শক্তিধরের শুধু শক্তিই নেই, তার সংগে আছে যাদুশক্তিও।

পিঁপড়ের মত ছোটটি হয়ে শক্তিধর প্রসাদের ভিতর চলে গেল যাদু খোক্কসের কাছে। যাদুখোক্কস পিঁপড়ের মত শক্তিধরকে দেখতেই পেল না।

তখন প্রাসাদের মধ্যে বসে যাদু-খোক্কস বলছে—"হুঁ, হুঁ, আমার মনটা কেমন যেন আনচান করছে। ডান হাতটা কেমন যেন অবশ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই এক নম্বর বেঁটে খোক্কসের কিছু হয়েছে। তা না হোলে আমার ডান হাতটা এমন হবে কেন?"

যাদু খোক্কসের পাশে তার ছোট ছেলে ক্ষুদে খোক্কস বসে ছিল। সে বল্ল—"কি যে বল বাবা। তিন-তিনটে খোক্কসমামা প্রাসাদ পাহারা দিচ্ছে। তাছাড়া জংগল পাহারা দিচ্ছে পালোয়ান মোটা-রাক্ষস। এছাড়া তো তুমি আছই। কার সাহস হবে এখানে এসে তোমার ক্ষতি করবার?"

"ঠিক বলেছিস। হয়ত এসব মনের ভুল। আমি যাদুখোক্কস, আমার ক্ষতি করবার সাহস হবে কার?"—এই বলে যাদুখোক্কস খেলা করতে লাগল ক্ষুদে খোক্কসের সংগে। আর সেই ফাঁকে পিঁপড়ের মত ছোট রিপুদমন পালিয়ে ফিরে এল বাগানে। তারপর যাদু পাতাটা বাঁ হাতে নিয়ে নিজের চেহারায় ফিরে যেতে চাইল। সংগে সংগেই আবার সেই বিশাল চেহারার শক্তিধর রিপুদমন হয়ে গেল। তারপর রিপুদমন বন্ধু রাক্ষসকে যা যা দেখেছিল সবকিছুই বল্ল।

সব শুনে বন্ধু রাক্ষস বল্ল—"ঠিক আছে। এইবার দুই নম্বর বেঁটে খোক্কসকে ধরতে হবে।" এরপর রিপুদমন গুহার মধ্যে আবার লুকিয়ে পড়ল।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় দুই নম্বর বেঁটে খোক্কস যখন প্রাসাদের চারপাশ পাহারা দিচ্ছে তখন আগের দিনের মত বন্ধু রাক্ষস হঠাৎ চিৎকার করে উঠল।

চিৎকার শুনে দুই-নম্বর বেঁটে খোক্কস ছুটে এল। জিজ্ঞেস করল—"কি ব্যাপার, মোটা রাক্কস? চিৎকার করলি কেন? রিপুদমনের বন্ধু মোটারাক্কস বল্ল—"সামনের গুহাটার মধ্যে এক বিদঘুটে চেহারার লোক এসে লুকিয়ে আছে। আমি তাই একলা ঢুকতে সাহস করছি না। আমি বরং বাইরে দাঁড়াচ্ছি। তুমি তার চাইতে ভিতরে ঢুকে দেখতো ঐ বিদঘুটে লোকটাকে শেষ করতে পার কিনা।"

একথা শুনে দু-নম্বর বেঁটে খোক্কস বল্ল—"ও, তাহলে তুইই বোধ হয় সেই বদমাস যে আমার এক নম্বর ভাইকে শেষ করে-ছিস্। দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোর মজা। একবার তুই বাইরে আয়" এই বলে দু নম্বর বেঁটে খোক্কস গুহাটার সামনে বিরাট চিৎকার সুরু করল।

ওদিকে শক্তিধর রিপুদমনতো পুরো তৈরী হয়েই ছিল। সেও তখন দৌড়ে বেরিয়ে এল গুহা থেকে। তারপর চাষীর দেওয়া সেই যাদু-বাশীটা ফু-ফু করে তিনবার বাজাল। আর সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল লড়াই।

বেঁটে খোক্কস হাজার চেষ্টা করেও কিন্তু রিপুদমনকে কাৎ করতে পারল না। পারবে কেমন করে। চাষীর দেওয়া যাদুবাঁশী রিপুদমনকে সমানেই বিপদ থেকে রক্ষা করল। এদিকে কিন্তু লড়তে লড়তে দুনম্বর বেঁটে খোক্কস একসময়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আর সেই ফাঁকে রিপুদমন তার বিরাট বিদঘুটে একমণি গদাটা দিয়ে ধাঁ ধাঁ করে পেটাতে সুরু করল। ঐ গদার মারের চোটে দুনম্বর বেঁটে খোক্কস তখন মাটিতে পড়ে সংগে সংগেই মারা গেল।

রিপুদমন তখন বন্ধুরাক্কসকে বল্ল—"যাই একবার, দেখে আসি যাদু খোক্কস কি করছে প্রাসাদে। তাছাড়া দুনম্বর খোক্কস যে মারা গেছে সেটাও বুঝতে পেরেছে কিনা জানা দরকার।"

এই বলে রিপুদমন যাত্নপাতাটা ডান হাতে নিয়ে পিঁপড়ের মত ছোট্টটি হোয়ে গেল। তারপর রাজপ্রাসাদে ঢুকে যাত্ন খোক্কসের সামনে এল। যাত্ন-খোক্কস কিন্তু পিঁপড়ের মত ছোট রিপুদমনকে দেখতেও পেল না।

যাত্নখোক্কস তখন প্রাসাদের মধ্যে বসে বলছে—"হুঁ, হুঁ, মনটা আমার কেমন যেন আন্‌চান্‌ করছে। আমার এই বাঁ-হাতটা কেমন যেন অবশ হয়ে গেছে। তাহলে নিশ্চয়ই তু-নম্বর খোক্কসটারও কিছু হয়েছে। তা নাহলে আমার বাঁ হাতটা এমন অবশ হয়ে যাবে কেন ?"

যাত্ন-খোক্কসের ছোট ছেলে ক্ষুদেখোক্কস তখন তার বাবাকে বল্ল—"কি যে বল বাবা। তিন-তিনটে খোক্কসমামা প্রাসাদ পাহারা দিচ্ছে। তাছাড়া জংগল পাহারা দিচ্ছে পালোয়ান মোটা রাক্ষস। এছাড়া তো তুমি আছই। কার এত বড় বুকের পাটা হবে তোমার ক্ষতি করবার ?"

ছেলের কথা শুনে মুচ্‌কি হেসে যাত্নখোক্কস বল্ল—"তা তুই ঠিকই বলেছিস্‌। এসব হয়ত আমার মনের ভুল। আমি যাত্নকর যাত্নখোক্কস। আমার ক্ষতি করার সাহস হবে কার!"

—এই বলে যাত্নখোক্কস ছেলের সংগে খেলতে লাগল। আর সেই ফাঁকে পিঁপড়ের মত ছোট্ট রিপুদমন একছুটে পালিয়ে এল বাগানে, বন্ধু রাক্ষসের কাছে। তারপর যাত্নপাতাটা বাঁ-হাতে নিয়ে শক্তিধর রিপুদমনের চেহারায় ফিরে গেল।

রিপুদমন ফিরে এসে বন্ধু রাক্ষসকে যা দেখেছিল সবকিছুই বলে, বল্ল—"ঠিক আছে, এইবার শেষ করবার পালা তিন-নম্বর বেঁটে খোক্কসকে। আর তারপর শেষ লড়াই হবে যাত্নখোক্কসের সংগে।"

এরপর বন্ধুরাক্ষসের কথামত রিপুদমন আবার লুকিয়ে থাকল গুহাটার মধ্যে। তৃতীয় দিন সন্ধ্যেবেলায় তিন-নম্বর বেঁটে-

খোক্কস যখন প্রাসাদের চারদিক পাহারা দিচ্ছে, তখন বন্ধুরাক্ষস হঠাৎ চিৎকার করে উঠল।

চিৎকার শুনে তিন নম্বর বেঁটেখোক্কস ছুটে এল। এসে জিজ্ঞেস করল—"কি ব্যাপার? মোটারাক্ষস তুই অমন চিৎকার করলি কেন?"

রিপুদমনের বন্ধু মোটারাক্ষস বল্ল—"সামনের গুহাটার মধ্যে বিদঘুটে একটা লোক এসে লুকিয়ে আছে। আমি একলা ঢুকতে সাহস করছি না। আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি। তুমি বরং ভিতরে ঢুকে দেখতো ঐ বিদঘুটে লোকটাকে শেষ করতে পার কিনা।"

একথা শুনে তিন-নম্বর বেঁটেখোক্কস বল্ল—"ওঃ, তাহলে তুই-ই সেই বদমাস যে আমার দুই ভাই একনম্বর আর দুনম্বর বেঁটে-খোক্কসদের শেষ করেছিস। দাঁড়া দেখাচ্ছি তোর মজা।" এই বলে বিকট চিৎকার করতে করতে তিন-নম্বর বেঁটে খোক্কস গুহাটার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

শক্তিধর রিপুদমনও তখন লড়াই-এর জন্য তৈরী। সে চাষীর দেওয়া যাদুবাঁশীটা তিনবার ফুঁ ফুঁ করে বাজাল। তারপর লড়াইএ নেমে পড়ল। গুহার মধ্যে ধূম-ধাক্কা, হৈ-হল্লা করে লড়াই চলতে লাগল। দুজনেই লড়তে লড়তে বাইরে এসে পড়ল। অনেকক্ষণ লড়াই চলার পর তিন-নম্বর বেঁটেখোক্কস ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সেই সুযোগে রিপুদমন তার বিরাট বিদ্ঘুটে গদা দিয়ে ঠাঁ-ঠাঁ করে বেঁটেখোক্কসকে পেটাতে সুরু করল। সেই প্রচণ্ড মারের চোটে তিন নম্বর খোক্কস মাটিতে পড়ে ছট্-ফট্ করে মারা গেল।

এইবার বন্ধু রাক্ষস বল্ল—"পালোয়ান বন্ধু, তিনজন বেঁটে-খোক্কসকে তুমি সহজেই মারতে পেরেছ। কিন্তু যাদুকর ঐ যাদু খোক্কসকে মারা তত সহজ হবে না। একবার যদি যাদুখোক্কস

তোমাকে প্রাসাদের মধ্যে দেখতে পায় তাহলে যাদুবলে হয় তোমায় পাথর করে দেবে, নয়ত রাক্ষস করে দেবে। তাই এইবার তুমি আর প্রাসাদের মধ্যে যেও না। আমিই বরং প্রাসাদের মধ্যে যাই। যাদু খোক্কসকে আমি গিয়ে বলব যে একটা অদ্ভুত মানুষ গুহাটায় লুকিয়ে আছে। আর সেই লোকটাই বেঁটেখোক্কসদের মেরে ফেলেছে। এসব শুনলে যাদু খোক্কস রেগে প্রাসাদের বাইরে এই গুহাটার সামনে চলে আসবে। যাদু খোক্কস এই গুহাটায় কখনও ঢোকে না, তাই এবারও ঢুকবে না। এইবার তোমায় যাদু খোক্কসের সংগে লড়াই করতে হবে তাকে মারবার জন্য। কিন্তু সাবধান শক্তিধর, যাদু খোক্কসের চোখের সামনে তুমি যেও না, তাহলেই কিন্তু সেই চোখের আগুনে-হলকায় তুমি শেষ হয়ে যাবে।"

রিপুদমন মন দিয়ে সবকথা শুনল। তারপর বল্ল—"কিচ্ছু ভেব না। দেখনা আমি কি করি।"

বন্ধু-রাক্ষসও এরপর ঐ রাজপ্রাসাদের ভিতরে চলে গেল। আর শক্তিধর রিপুদমন লুকালো গুহাটার মধ্যে। গুহার মধ্যে লুকাবার আগে, কিছু কিছু লম্বা-লম্বা পেরেক আর একটা শক্ত হাতুড়ি এনে গুহাটার মধ্যে লুকিয়ে রাখল।

বন্ধুরাক্ষস দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে যাদুখোক্কসকে সবকিছু বল্ল। যাদুখোক্কস শুনেই রাগে গরগর করতে থাকল। চোখদুটো তার ভাটার মত বন্‌বন্ করে ঘুরতে লাগল।

যাদুখোক্কস প্রচণ্ড রাগে বলতে লাগল—"ওঃ, এইজন্যই আমার ডানহাতটা আর বাঁ-হাতটা অবশ হয়ে গেছে। চোখেও ভাল দেখছি না। কিন্তু তবুও দেখ না, ঐ বদমাস লোকটাকে কি করি।"—এই কথা বলেই হুড়মুড় করে যাদুখোক্কস ছুটে এল গুহাটার সামনে।

গুহার সামনে এসে বল্ল—"নচ্ছার, পাজী, বদমাস মানুষ, তুই

আমার তিন বেঁটেখোক্কস ভাইকে মেরেছিস্। ভাবছিস্, আমার হাতদুটোয় জোর নেই, চোখে ভাল দেখছি না, তাই বলে তুই বেঁচে যাবি। দেখ এবার কি করি।”

এই বলে যাদুখোক্কস তার জিবটাকে লম্বা করে গুহাটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। লক্‌লকে জিব দিয়ে আগুণের ফুলকি ছুট্‌তে থাকল। যাদুখোক্কস ভাবছে আগুণের ঐ হলকায় এবার বুঝি রিপুদমন পুড়েই যাবে।

রিপুদমন কিন্তু সবকিছুর জন্যই প্রস্তুত ছিল। সে আগেই সেই যাদুবাঁশীটা ফুঁ-ফুঁ করে তিনবার বাজিয়ে রেখেছে যাতে তার কোনও বিপদ না হয়। তারপর ক্ষুদে রাজপুত্রের দেওয়া যাদুপাতাটা ডানহাতে নিয়ে খুব ছোট্টটি হয়ে গেছে। খু-উ-ব ছোট্ট মানুষটি হয়ে রিপুদমন চলে এল যাদুখোক্কসের লক্‌লকে জিবটার কাছে। যাদুবাঁশীর যাদুশক্তির জন্য খুব কাছে আসলেও সে পুড়ে গেল না। তখন রিপুদমন হাতুড়ি দিয়ে পট্‌পট্ করে কয়েকটা পেরেক যাদুখোক্কসের জিবটার উপর মেরে দিল। সংগে সংগে জিবটা আটকে গেল গুহাটার দেওয়ালটার গায়ে।

যাদুখোক্কস তখন রাগে-ব্যাথায় চিৎকার করে উঠল। কিন্তু কিছু করবার উপায়ও নেই, জিবটা আটকানো। তাই নড়াচড়া করতে পারছে না। সেই ফাঁকে ছোট্টটি হোয়ে রিপুদমন গুহাটার বাইরে চলে এল। বাইরে এসেই বাঁ-হাতে যাদুপাতা নিয়ে নিজের পালোয়ানী চেহারায় ফিরে গেল।

রিপুদমন তখন তার একমণি গদা দিয়ে ধাঁ-ধাঁ করে প্রচণ্ডজোরে যাদুখোক্কসকে পেটাতে লাগল। যাদুখোক্কস নড়তেও পারে না, চড়তেও পারে না, কারণ লকলকে জিবটা গুহাটার মধ্যে আটকানো। দুটো হাত তার অবশ, চোখেও ভাল দেখতে পারছে না। তাই বাধ্য হোয়ে রিপুদমনের একমণি গদাটার মার

খেতে খেতে শেষে চিৎপাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর তার পর হাত-পা ছড়িয়ে মরে গেল।

যাহু খোক্কস মারা যাওয়ার সংগে সংগেই রিপুদমন দেখে তার বন্ধু-রাক্ষস হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। তার বদলে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক সুপুরুষ রাজা।

সেই সুপুরুষ রাজা বল্ল—"আমি সত্যিকার রাক্ষস নই। আমিই ছিলাম বিন্ধ্যগড়ের রাজা। আমার এই রাজ্য আক্রমণ করে মায়াবী খোক্কস-রাজা আমাকে যাহুবলে রাক্ষস করে দেয়। আর আমার রাণী, লোকজন, সৈন্য সামন্ত, সবাইকে পাথর করে রাজপ্রাসাদের মধ্যে রেখে দেয়। যাহু-খোক্কসকে মেরে তুমিই আজ আমাদের সবাইকে মুক্তি দিলে।"

বিন্ধ্যগড়ের রাজার সংগে রিপুদমন প্রাসাদের ভিতরে এল। রাজপ্রাসাদে সে অন্ধকার আর নেই। সমস্ত প্রাসাদ আলোয় ঝলমল করছে। লোকজন দাসদাসীতে প্রাসাদ ভর্তি। রাজাকে দেখে রাণীও খুব খুশী।

বিন্ধ্যগড়ের রাজা তার রাণীকে তখন বল্লেন—"এই যে শক্তিধর লোক দেখছ, এই কিন্তু যাহু-খোক্কসকে মেরে আমাদের সবাইকে বাঁচিয়েছে। এখন একে পুরস্কার দেওয়া উচিত।"

রাজ্যের সবাই বল্ল—"নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।"

রাণী বল্লেন "শক্তিধর যা চাইবে আমরা ওকে তাই-ই দেব। যত সোনা-দানা, মণিমুক্তা চাইবে সব পাবে।"

শক্তিধর রিপুদমন বল্ল—"আমি তো কোন অর্থের লোভে একাজ করিনি। বন্ধু-রাজাকে সাহায্য করবার জন্যই এসব করেছি। তবে তোমরা সবাই মুক্তি পেয়েছ তাতে আমার এই লাভ যে রাণীর ছোট বোন ছোট রাজকন্যা এইবার আমায় বিয়ে করতে রাজী হবে।" —এই বলে রিপুদমন কেন এখানে এসেছিল সবকিছু রাণীকে বল্ল।

সবশুনে বিন্ধ্যগড়ের রাজা-রাণীর আর আনন্দ ধরে না। রাণী বল্ল—"তোমার মত শক্তিধর, সৎ, নির্লোভ লোকের সংগে আমার ছোট বোনের বিয়ে হচ্ছে জেনে আমি সবচেয়ে খুশী।" বিন্ধ্যগড়ের রাজা-রাণী রিপুদমনকে সংগে সংগে কিছুতেই ছেড়ে দিলেন না। তাকে কত যে আদর-যত্ন করলেন তার আর হিসেব নেই। এক সপ্তাহ পরে একটা লোহার মজবুত সুন্দর গাড়ী দিলেন রিপুদমনকে ফিরে যাওয়ার জন্য। রিপুদমনও বিন্ধ্যগড়ের রাজা-রাণীকে তাদের বিয়েতে আসার জন্য বারবার অনুরোধ করে এল। তারাও সস্নেহে এতে রাজী হোলেন।

এরপর রাজ্যে ফিরে এল রিপুদমন। ছোট রাজকন্যা আর রাজাকে সবকিছু জানাল। যাদুকর খোক্কসরাজের হাত থেকে বিন্ধ্যগড়ের রাজা-রাণী সবাই মুক্তি পেয়েছে জেনে সবার আর আনন্দের সীমা রইল না।

তারপর একদিন খুব ধুমধাম করে রিপুদমনের সংগে ছোট রাজ-কন্যার বিয়ে হোয়ে গেল। সেই বিয়েতে বিন্ধ্যগড়ের রাজা-রাণী কত যে দামী দামী সোনা-দানা রিপুদমনকে উপহার দিলেন তার আর হিসেব নেই।

বিয়ের পর রাজকন্যা, ধন-দৌলত সবকিছু নিয়ে রিপুদমন গ্রামে ফিরে এল, বাবা আর মায়ের কাছে।

রিপুদমন যে সত্যিই রাজকন্যা—রাজত্ব সবকিছু নিয়ে ফিরবে এতো আর চাষী বাবা-মা কল্পনাও করতে পারে নি। তাই এসব দেখে ওদের খুশীর সীমা রইল না।

এরপর বৃদ্ধরাজা মারা গেলে রিপুদমন সে রাজ্যের রাজা হোল। গ্রাম থেকে বাবা মাকে নিয়ে রিপুদমন রাজ্যে ফিরে গেল রাজ্য শাসন করবার জন্য। পালোয়ান শক্তিধর রিপুদমন, তার যাদু বাঁশী আর যাদু-পাতা সমস্ত বিপদ থেকে ওকে আগলে রাখত। তাই এরপর রিপুদমন তার বাবা-মা-রাজকন্যাকে নিয়ে সুখে

রাজত্ব করতে লাগল।

শক্তি আর সৎ সাহসের চেয়ে বড় সম্পদ আর নেই রিপুদমনের দুটোই ছিল। তাই সে পেল রাজকন্যা আর রাজত্ব। তোমাদের এই দুটো গুণ থাকলে, চেষ্টা করলে, তোমরাও হয়ত রাজত্ব আর রাজকন্যা পেতে পার।

—শেষ—